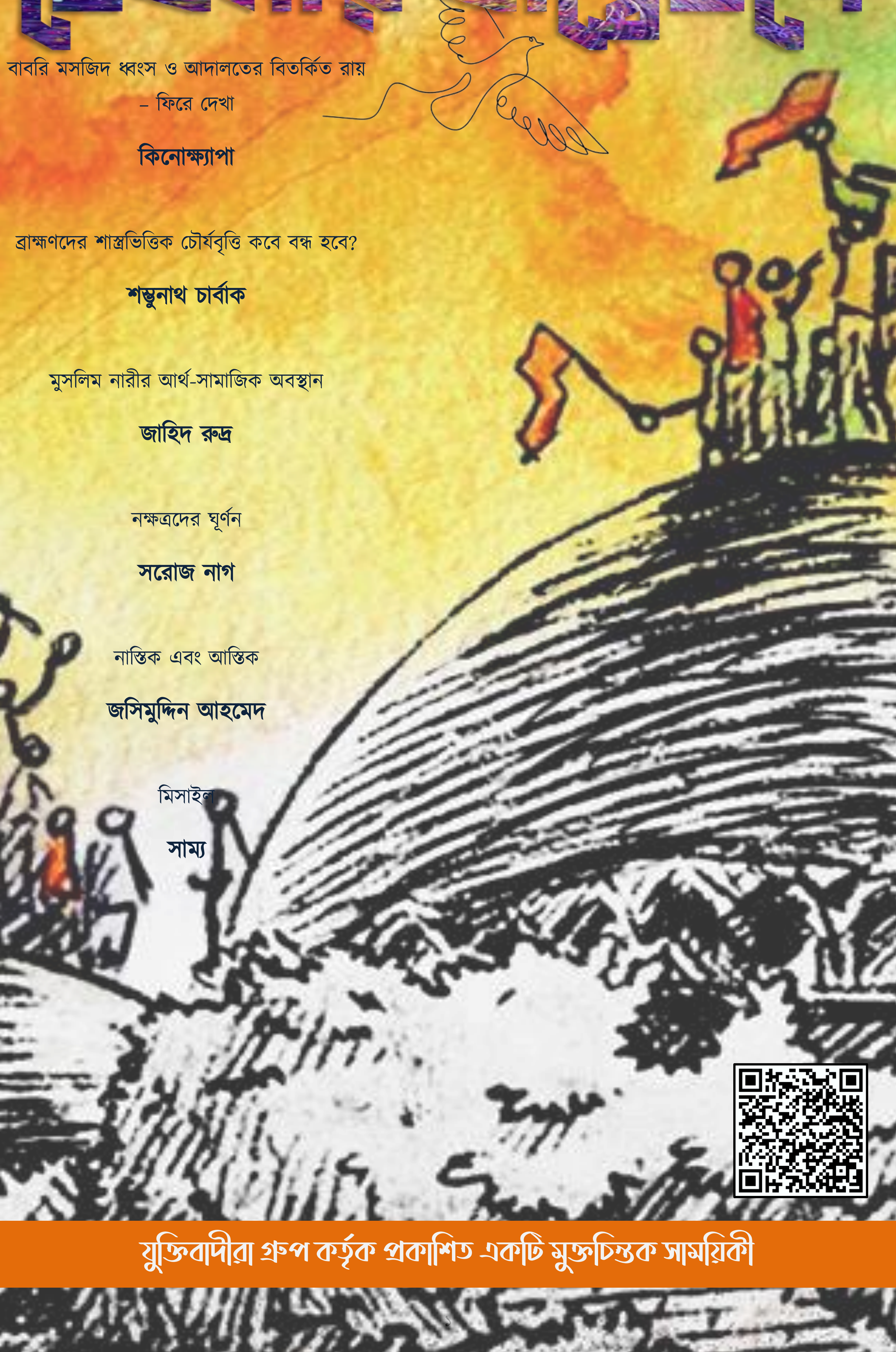
ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০২২

প্রকাশ সংখ্যা - ২২

প্রকাশিত

চেতনায় অন্বেষণে



বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও আদালতের বিতর্কিত রায়
– ফিরে দেখা

কিনোক্ষ্যাপা

ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রভিত্তিক চৌর্যবৃত্তি কবে বন্ধ হবে?

শম্ভুনাথ চার্বাক

মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান

জাহিদ রুদ্র

নক্ষত্রদের ঘূর্ণন

সরোজ নাগ

নাস্তিক এবং আস্তিক

জসিমুদ্দিন আহমেদ

মিসাইল

সাম্য

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০২২

স ম্পা দ ক

যু ক্তি বা দী রা

প্র কা শ সং খ্যা
বা ই শ

স হা য় তা য়
অভিষেক, মধুমিতা, দেবস্মিতা
অরিন্দম, সজল, শক্তি, উপেন,
পার্থপ্রতিম
ও কিনোক্ষ্যাপা।

যো গা যো গ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp-9433794113
Telegram:@Yuktibadira
Website:rationalists
ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

সূ চি

প্র ব ন্ধ - নি ব ন্ধ:

ক বি তা:

পিডিএফ পড়ার ভালো এক্সপেরিয়েন্সের জন্য অডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন।

যে লেখাটি পড়তে চান সূচিপত্রে সেই টাইটেলটিতে ক্লিক করুন।

প্রতিটি লেখার ওপরে সূচিপত্র বাটন পাবেন তা ক্লিক করে সূচিতে ফেরত আসতে পারবেন।

ড্রাইভ পিডিএফ ভিউয়ার অ্যাপে এই ফিচার কাজ করবে না।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে 'চেতনার অন্বেষণে'র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংর্বধনা জ্ঞাপন করছি মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী



সৌরাষ্ট্র দাশ মহাশয়কে।

তাঁর বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা পরিচিত, সাধারণ সম্পাদক এক্স হিন্দু এথিস্ট।

সম্পাদকীয়

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে হয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটি তৈরি হয়েছে, প্রচুর মুক্তচিন্তক তাতে যুক্ত হয়েছেন।

বই ভান্ডারটিকে যেমন আপডেট করে আসছিলাম সেটি কয়েকদিন বন্ধ আছে আশাকরছি খুব তাড়াতাড়ি শুরু করা যাবে। ওয়েবজিন ও অডিওবুক এই দুই ফরম্যাটেও মুক্তচিন্তকদের লেখাপত্রকে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।

আপনারা যেভাবে সবকিছুকেই সাদরে গ্রহণ করে আসছেন তা নিয়ে বলার কোনও জায়গা নেই। শুধু এটুকু সরকারের চরম দুর্নীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কলম তুলে নিন। যেমনটা পারছেন তাই লিখুন। ‘চেতনার অন্বেষণে’-তে ভারিক্কি লেখা কিংবা বিশেষজ্ঞরাই লিখবেন এবং সেইসব লেখা প্রকাশিত হবে একেবারেই নয়। আমরা চাই সমস্ত মুক্তচিন্তক লিখুক। প্রশ্ন করুক। মাত্র পাঁচলাইন লিখুন গোটামাসে এবং তা পাঠান। Ask Rationalists ক্যাম্পেইন সফল হয়েছে অনেক মানুষ প্রশ্ন করেছেন তারমধ্যে কিছু কিছু প্রশ্নের জায়গা দিয়েছি, সেসব শেষের দিকের পাতায় পড়তে পারবেন।

কেমন লাগছে পত্রিকাটি অবশ্যই জানাবেন। আমাদের পাওয়া বলতে ওটুকুই।

সবাইকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন। ভালো চিন্তা করুন এবং লেখালেখি করুন।

২৫, ডিসেম্বর, ২০২২

মুক্তচিন্তকদের বই ভান্ডারে আসুন -

চে ত না

অথবা টেলিগ্রামে সার্চ করুন - @Yktibadira

প্রশ্ন করুন যুক্তিবাদীদের

Ask Rationalists

আপাত অতিপ্রাকৃত ঘটনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ঈশ্বর, ভূত, আত্মা, কোনও ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত উত্তরের খোঁজ করে থাকলে প্রশ্নটি যুক্তিবাদীদের বলুন।

প্রশ্নটিকে সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছে দেব, এবং উত্তর পাবেন 'চেতনার অন্বেষণে' পত্রিকার আগামী সংখ্যায়।

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও আদালতের বিতর্কিত রায় – ফিরে দেখা

লি খে ছে ন – কি নো ক্ষ্যা পা



"যুদ্ধক্ষেত্রের পরে আদালতের কক্ষই হলো সেই স্থান যেখানে ইতিহাসের সবথেকে জঘন্য অন্যায়গুলোর মধ্যে কিছু ঘটেছে।" - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ১৯২২ সালের ২৪-এ জানুয়ারী আদালতে দেওয়া বিবৃতি।

"সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়"। দেশের একেবারে সামনের সারির এক গবেষণা সংস্থা CSIR গত

২১-এ নভেম্বর গর্বের সাথে ট্যুইট করে জানিয়েছে যে একদল বিজ্ঞানী প্রদর্শনী করে দেখিয়েছেন কিভাবে ২০২৪ সালের রামনবমীর দিন অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার মূর্তির উপরে সূর্যের আলো এসে পড়বে। এই খবরটায় যাঁরা ভীষণ অবাক হয়েছেন, দুই বছর আগের এই খবরটা হয়তো তাঁদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল যে – প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট' এমনভাবে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করবে যাতে প্রতি বছর রামনবমীর দিন রামলালার মূর্তির উপর সূর্য রশ্মি এসে আছড়ে পড়ে (টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, ১৭ নভেম্বর ২০২০)। তারপর থেকেই সেই ট্রাস্ট এই ব্যাপারে CSIR-এর সাহায্য নিয়ে চলেছে। আরও এক বছর পিছিয়ে যাওয়া যাক।

৯ নভেম্বর ২০১৯ – বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়ে রায় জানালো সুপ্রিম কোর্ট। 'গণতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদির মুখে কালি মাখিয়ে অবসান হলো কয়েক দশক পুরোনো এক বিতর্কের। আরও অতীতে যাওয়ার আগে বরং এই বিতর্কিত রায় নিয়ে কিছু কথা হয়ে যাক।

রায়ের শেষে একটা সংযোজনে স্পষ্টই জানানো হয়েছে যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুদের "বিশ্বাস"-এর উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুরা যেহেতু "বিশ্বাস" করেন যে বাবরি

মসজিদের ঐ নির্দ্দিষ্ট অক্ষ্যাংশ-দ্রাঘিমাংশেই রামলালা-র জন্ম সেহেতু ভগবান শ্রী রাম ঐখানেই জন্মেছেন, এবং তাই "মন্দির ওঁহি বানায়েঙ্গে"। মন্দির ভাঙ্গার আগে RSS-BJP ঠিক এটাই বলে এসেছে। যেমন, ৫ জুন ১৯৮৯-এ একটা চিঠিতে বাজপেয়ী লিখেছিলেন, "রাম ঠিক কোনখানে জন্মেছিলেন সেটা নির্দ্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়"; লালকৃষ্ণ আডবানী ১ অক্টোবর ১৯৯০-এ বলেছিলেন, "এটা যে শ্রী রামের জন্মস্থান সেটা কেউই প্রমাণ করতে পারবেন না", কারণ এটা বিশ্বাস, আর বিশ্বাসকে কি প্রমাণ করা যায়! RSS-সুপ্রিমো এম.ডি.দেওরাস তো ১১ জুন ১৯৮৯-এ লিখেইছিলেন যে, "এটা এমন বিষয়ই নয় যেখানে আইনব্যবস্থা নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে পারে।" কিন্তু তিরিশ বছর পরে তাঁদেরকেও হয়ত অবাক করে দিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত! কারণ, "... হ্যায় তো মুম্‌কিন হ্যায়"। তাই সর্বোচ্চ আদালত এই রায়ের মূল্যায়নে জানিয়েছে, "মসজিদ নির্মাণের আগে থেকে এবং পরবর্তীকালে হিন্দুদের সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান রামের জন্মস্থান হলো সেই স্থান যেখানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, এবং এই বিশ্বাসের পক্ষে লেখ্য ও মৌখিক প্রমাণও আছে।" [দেখুন – *Supreme Court Denies Justice*]। এখানে লেখ্য প্রমাণ বলতে কিছু ধর্মীয় পুঁথির কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে RSS-এর পোষা ঐতিহাসিকরা বাদ দিয়ে বাকি সকলেই সন্দিহান, এবং মৌখিক প্রমাণ বলতে বোঝানো

হয়েছে সেই "বিশ্বাস"-কে। তবে সবথেকে মজার ব্যাপার হল, সাধারণত প্রথা অনুযায়ী একটা রায়ের শুরুতে রায়দাতাদের নাম উল্লেখ করা থাকে; এক্ষেত্রে যেটা নেই। রায়ের নিচে পাঁচ বিচারপতির সই থাকলেও, রায়ের সংযোজনে যেখানে "বিশ্বাস"-এর উপর জোর দিয়ে পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে সেখানে কারও সই নেই! [দেখুন – *Secularism at stake*]। প্রশ্ন থেকেই যায় যে তাহলে কি রায়দাতারা কি নিজেরাই নিজেদের এই রায়কে "বিশ্বাস" করেন না?

সবটাই যখন "বিশ্বাস"-এর ভিত্তিতে তখন মামলার খুঁটিনাটি নিয়ে অযথা বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। কিন্তু তাও কিছু কথা না বললেই নয়। যেমন, এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে বিতর্কের প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৮৫ সালে। বাবরি মসজিদের চৌহদ্দির ভিতরে ১৮৫৫ সালে একটা চবুতরা নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিমদের বিবাদ বন্ধ করার জন্য চবুতরা আর মসজিদের মধ্যে প্রাচীরও তৈরি করা হয়েছিল। তখন থেকে সেই প্রাচীরের ভিতরে মসজিদে মুসলিমরা প্রার্থনা করেন, এবং বাইরে রাম-চবুতরাতে হিন্দুরা প্রার্থনা করেন। সেই রাম-চবুতরাকে রাম জন্মভূমি হিসাবে দেখিয়ে মন্দির নির্মাণের প্রথম আর্জি শুরু হয় ১৮৮৫-৮৬ সাল নাগাদ। এই সংক্রান্ত সেই সময়ের প্রতিটা মামলায় রাম জন্মভূমি হিসাবে চবুতরাটাকেই বিবেচনা করা হয়েছে, একবারের

জন্যও বাবরি মসজিদ এই বিতর্কের মধ্যে আসেনি। হিন্দুত্ব রাজনীতির প্রথম দিককার পথিকৃৎ – সাভারকার, বালগঙ্গাধর তিলক, মদন মোহন মালব্য, বা লালা লাজপত রাই – কাউকেই কখনও শোনা যায়নি বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি জানাতে। [দেখুন – *Supreme Court Denies Justice*]। মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি হয়েছিল – এই আখ্যানও আসলে সাম্প্রতিক; ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসকদের মদতে রচিত বিকৃত ইতিহাসের একটা অংশ। বাবরি মসজিদ তৈরি হয় ১৫২৮ সালে। যদিও, 'বাবরনামা'-তে মন্দির ভেঙে এই মসজিদ তৈরি হয়েছে বা রাম-জন্মভূমিতে মসজিদ তৈরি হয়েছে – এমন কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর হিউয়েন সাং-ই হোক, বা একাদশ শতকের আলবেরুনী – কারো রচনাতেই অযোধ্যাকে রামজন্মভূমি হিসাবে উল্লেখ করতে দেখা যায় না। তবে সেইসব বাদ দিন! হিন্দু রাষ্ট্রের জনতা ম্লেচ্ছদের লেখা ইতিহাসে বিশ্বাস করবেনই বা কেন! কিন্তু বাবরি মসজিদ যদি সত্যিই মন্দির ভেঙে তৈরি হত তাহলে অন্তত ১৫৭৪ সালে তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস'-এ তার কিছু উল্লেখ বা আভাস নিশ্চই থাকত! তা না হলে যে বলতেই হয় তুলসীদাস 'সাচ্চা হিন্দু' ছিলেন না! যাইহোক, সেই আমলের বিভিন্ন সংস্কৃত পুঁথিতে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে অযোধ্যার উল্লেখ থাকলেও সেটাকে রামজন্মভূমি হিসাবে

উল্লেখ করার নিদর্শন পাওয়া যায় না। যে ‘স্কন্দ পুরাণ’ নিয়ে এতো হৈচৈ সেখানেও অযোধ্যাকে রামজন্মভূমি বললেও নির্দ্দিষ্ট করে অযোধ্যার ঠিক কোনখানে রামলালা জন্মেছিলেন সেই কথা বলা নেই। [দেখুন – *ASI's archaeological findings in Ayodhya: Short shrift to facts*]। ‘স্কন্দ পুরাণ’-এর রচনা আনুমানিক ১৬০০ সালে। তাহলে ১৫২৮ সালে সত্যিই যদি মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি হতো তাহলে কি সেই কথা বড় বড় অক্ষরে ‘স্কন্দ পুরাণ’-এ লেখা থাকতো না? “আপ ক্রোনোলজি সমঝিয়ে”!

এমনকি একটা আরও মজার প্রশ্ন হল অযোধ্যার রাম-জন্মভূমিতে ঠিক কোন রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন? এ.কে. রামানুজন-এর বিখ্যাত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ‘থ্রি হান্ড্রেড রামায়ণ্স’ থেকে জানা যায় যে বীর নায়ক রাম-কে ঘিরে ৩০০-টারও বেশি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভারত ও এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। মূল রামায়ণ বলে কিছু হয় না, এবং বাল্মীকির রামায়ণ হিসাবে যেটা জনপ্রিয় সেটাও আসলে এই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানগুলোর মধ্যে একটা। উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধ জাতক কাহিনী দশরথ জাতক-এর কথা বলা যেতে পারে। এই আখ্যান অনুযায়ী রাম আর সীতা ভাই-বোন, এবং নির্বাসিত জীবনের পর রাম নিজের বোন সীতাকে বিয়ে করেন। এই আখ্যান উপজাতীয় সমাজের একটা আদিম পর্যায়কে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে যেখানে

একই প্রজন্মের একই পরিবারের ছেলে-মেয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক একটা ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই, এই ধরনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ RSS-BJP-র পছন্দ নয়। কারণ, এই জাতীয় তথ্য RSS-BJP-র রাম-কেন্দ্রিক রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। RSS-BJP-র 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' রাম তাঁদের মতোই বর্ণবাদী, নারীবিদ্বেষী। অন্য রাম-এর উপস্থিতি তাঁদের রাম-এর কাছে অস্তিত্বের সংকট হয়ে ওঠে। সেই কারণে হিন্দুত্ব বাহিনীর ক্রোধের সম্মুখীন হওয়ার পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে এই প্রবন্ধকে বাদ দেওয়া হয়।

এছাড়া, RSS-BJP-র দাবির উপর ভিত্তি করে ১৯৭০ সাল থেকে অযোধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চলছে। আজ পর্যন্ত মন্দির ধ্বংসের কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারেননি। অনেক 'বিশেষজ্ঞ' নিজেদের কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ফলাফলের কথা জানিয়েছেন। প্রতিটা ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই প্রতিবেদনগুলির সমালোচনা করে সেগুলোকে খণ্ডন করেছেন। যদিও সেই 'বিশেষজ্ঞদের' কাছ থেকে পাল্টা কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। এমনকি এই লজ্জাজনক বিষয়টাও উল্লেখ না করলেই নয় যে ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে এই 'বিশেষজ্ঞ' প্রত্নতাত্ত্বিকদের কয়েকজন মসজিদ ধ্বংস করে রাম মন্দির নির্মাণের হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন!

২০০৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) দ্বারা নতুন করে খনন করার নির্দেশ দেয়, যেটা সেই সময়ে সম্পূর্ণরূপে BJP-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যাইহোক, এমনকি ASI রিপোর্টেও কোন মন্দির বা তার ধ্বংসাবশেষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়নি। তবে নিজের প্রভুদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ASI ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মসজিদের ধ্বংসাবশেষের নিচে একটা বিশাল কাঠামোর উপস্থিতির কথা জানিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। খননের সময় ASI-এর আচরণ এবং তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনটা 'আলিগড় হিস্টোরিয়ান সোসাইটি' সমেত অনেকের দ্বারাই সমালোচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক শিরিন রত্নাগর যথার্থই বলেছেন যে, "পরিস্থিতি, মন্দির নির্মাণের পক্ষে যুক্তির বিষয়বস্তু এবং যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এগুলো গড়ে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য কিছু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন।" [দেখুন – *Archaeology at the Heart of a Political Confrontation*, pp. 243]।

সুতরাং, বলাই বাহুল্য যে মসজিদ ভেঙে রাম মন্দিরের নির্মাণের দাবি নোংরা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, যার সূত্রপাতও এক ডিসেম্বর মাসে, ১৯৪৯ সালের ২২-এ

ডিসেম্বর। ফৈজাবাদ-এর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ২৫ এপ্রিল ১৯৫০-এ নিজের লিখিত বয়ানে আদালতকে জানান যে, "মামলার সম্পত্তিটা বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত, এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের উপাসনার উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা শ্রী রাম চন্দ্রজীর মন্দির হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। বরং ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৯-এর রাতে, শ্রী রামচন্দ্রজীর মূর্তিগুলি গোপনে এবং অন্যায়ভাবে এর ভিতরে স্থাপন করা হয়েছিল।" [দেখুন – *Supreme Court Denies Justice*]। এই রাজনৈতিক নোংরামোর ধারাবাহিকতাই পরিণতি পায় ১৯৮০-র দশকে, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর (VHP) হাত ধরে। আর তখন শুধু বাবরি মসজিদ-ই নয়, সাথে মথুরা ও বারাণসী-র দুটো মসজিদ ধ্বংসের ডাক দেওয়া হয়। এই রাম মন্দির নির্মাণের দাবি যে নিখাদ রাজনীতি সেকথা RSS-BJP-র নেতাদের কথাতেও একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে।



১১-ই জুন, ১৯৮৯-এ আডবাণী বলেন, "আমি নিশ্চিত যে

এসবের কারণে অনেক ভোট পাওয়া যাবে।” ১৮-ই জুন ১৯৯১-এ তিনি স্পষ্টই জানান যে, “আমি যদি রামের তাসটা ঠিকঠাকভাবে না খেলতাম, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে নিউ দিল্লী নির্বাচনী এলাকা থেকে হারতাম।” নিজের আত্মজীবনী ‘মাই কান্ট্রি মাই লাইফ’-এও তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আগ্রাসনের ইতিহাসের আলোকে অযোধ্যাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা এবং তারপর এর সাথে সমান্তরালভাবে মন্দির আন্দোলনের বৈধতা খোঁজা।” এমনকি সুষ্মা স্বরাজ পর্যন্ত ১৪-ই এপ্রিল, ২০০০-এ স্বীকার করেন যে রাম-জন্মভূমি আন্দোলন ছিল “নিখাদ রাজনৈতিক এবং এর সাথে ধর্মের কোনো যোগ ছিল না।” [দেখুন – *How a Mosque Became a Temple*]।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দশ দিন পর ভারত সরকার কর্তৃক যে ‘লিবারহান কমিশন’ গঠন করা হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্টেই এই নোংরা রাজনীতির যথার্থ মূল্যায়ন করে বলা হয়েছিল, “[মসজিদ ধ্বংসের] প্রস্তুতিটা অসাধারণ রকমের গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল, এবং ধারাবাহিকতা ও নিশ্চিত ফলাফল সমেত সেটা ছিল প্রযুক্তিগতভাবে ত্রুটিহীন। ... মূল বিষয় ছিল ক্ষমতা। গোপন উদ্দেশ্যের সমর্থনে তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল এই ক্ষমতা। নেতারা জানেন কিভাবে আবেগকে জাগ্রত করা হয় এবং কিভাবে সেটা প্রতিরোধ করা হয়;

দেশের জন্য কোনটা ভালো হতো সেটার বদলে বরং তাঁরা সর্বদা এটাই দেখেন যে তাঁদের নিজেদের জন্য কোনটা ভালো হবে। অযোধ্যাতেও সেটাই হয়েছে।” [পাতা ৩৭৬ (৬১.৩০, ৬১.৩১); অথবা, দেখুন – *There Stood a Mosque in Ayodhya, and it was Demolished*]। ২৭ বছর পর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের যে বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে এই দীর্ঘ মন্দির-মসজিদ সমস্যার সমাধান ঘটানো হলো সেই রায় প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। দেশের জন্য যেটা ভালো হতো সেকথা না ভেবে শাসকশ্রেণীর অন্যায্য দাবির কাছে, ক্ষমতার কাছে মাথা নত করল ন্যায়বিচার।

মসজিদ ধ্বংসের জঘন্য ঘটনা এবং এই সর্বোচ্চ আদালতের এই বিতর্কিত রায় – দুটোরই যে নিন্দা জানানো প্রয়োজন তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও বোঝা প্রয়োজন যে ঠিক কোন বৃহত্তর অদৃশ্য ক্ষমতা এই ঘটনাক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। ১৯৯০-এর অর্থনৈতিক সংকট, IMF-এর হস্তক্ষেপ, তারপর সেই তথাকথিত ‘অর্থনৈতিক সংস্কার’-এর মাধ্যমে বিশ্বের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষার্থে বিদেশী লগ্নির জন্য ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত করে দিয়ে নয়া-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক শোষণের পথ প্রস্তুত করা, এবং

সেইসব থেকে ভারতের মেহনতী জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্ম আর বিশ্বাসের নামে তাঁদেরকে বিভক্ত করে দেওয়া, যার চূড়ান্ত পরিণাম RSS-BJP-র নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী বাহিনী কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংস – এই ঘটনা গুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ভুল হবে। সেই সময় কেন্দ্রের গদিতে বসে থাকা কংগ্রেস সরকারের ভূমিকাকেও সামনে আনা প্রয়োজন। প্রথমে শাহ্-বানো মামলায় বিতর্কিত রায় ও বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে একটা অশান্তির প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেওয়া এবং তারপর নিজের সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ১৯৯২ সালের ৬-ই ডিসেম্বর মসজিদ ধ্বংসের নারকীয় উল্লাসকে চুপটি করে উপভোগ করা – কংগ্রেস সরকারও নিজের দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। অরুন্ধতী রায় যথার্থই বলেছেন, "৯০-এর দশকের শুরুর দিকে দুটো তালা খুলে দেওয়া হয়েছিল – একটা বাবরি মসজিদের এবং আরেকটা বাজারের [অর্থনীতির উদারীকরণ]। এই দুটো তালা খুলে দিয়ে তাঁরা দুই ধরণের মৌলবাদকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন – একটা ধর্মীয়, আরেকটা অর্থনৈতিক।" [দেখুন – *Attempt to Destroy Gujarat Riots Legal Trail*]।

জনগণের উপর নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির আক্রমণ আজকে আরও তীব্র হয়েছে, এবং শাসক শ্রেণী আজকের

দিনেও হিজাব-হালাল ইত্যাদি কু-তর্কের চিৎকারে জনগণের ন্যায্য দাবির আওয়াজকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই দুই মৌলবাদকে আবার তালাবন্দী না করতে পারলে তাদের অশুভ আঁতাত থেকে জনগণের মুক্তি নেই।

অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে ওঠে, প্রতিরোধ তখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়!

- চে গুয়েভারা

সূচিপত্র

ঈশ্বরের স্বর্গবাস

লি খে ছে ন – ম হ ম্ম দ ম হ সী ন



বাড়ির কর্তা কী কী দায়িত্ব পালন করে? বাড়ির কর্তা কতটা ভাল খায়। কতটা মাখে। কতটা ভোগ করে। সাধারনত আমরা দেখি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তার দায়। তিনি থাকেন বটগাছের মতো। সংসারের সকলেই তার উপর নিশ্চিন্ত। তারা জানে, বাবা-মা নিজেরা না খেয়েও সকলের মুখে খাবার তুলে দেয়।

আচ্ছা বাবা-মা কি এর বদলে থ্যাঙ্কস চায়? 'আমায় পুজো করো পুজো করো, আমায় ভয় করো' বলে? নিজে থাকে স্বর্গে, তার হুকুম যে মানে, সেই ছেলেকে সঙ্গে নেয় সেই সুখের স্বর্গে। দস্যি ছেলেটিকে ছুঁড়ে দেয় নরকের যন্ত্রণা ভোগ করার জন্যে? আসল বাবা তো নিজের জন্য বেছে নেয় যন্ত্রণার জীবন, সন্তানকে দিতে চায় নিরাপদ, নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দময় জীবন।

বাবামায়ের সাথে ঈশ্বরের একটু তুলনা করে দেখুন, কার ত্যাগ বেশি।

হিন্দি সিনেমায় দেখি, ভিলেন তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বাজারে তোলা তোলে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সর্বদা। মানুষের মনে ভয় জিইয়ে রাখে। ভগবানের কাণ্ডকারখানাও সেই সিনেমার ভিলেনের মতো। মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করাই তার সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল কথা। লোকেও বলে থাকে, ভগবানকে ভয় করো। শ্রদ্ধা করো। ভক্তি করো। অর্থাৎ তারা জানে ভগবান ভয়ানক কিছু "একটা বা না-একটা" বিষয় বা বস্তু। তাকে ভয় করতে হয়, ভক্তি করতে হয়, ঠিক হিন্দি সিনেমার সেই ভিলেন যেমন চায়। ঈশ্বর পুজোর কাঙাল। ভক্তির কাঙাল, শ্রদ্ধার কাঙাল।

মানুষের যৌক্তিক চেতনার স্তর কেমন দেখুন।

এদিকে যতই জুজুর ভয় দেখানো হোক, শিশুর মন থেকে জুজুর ভয় একদিন কেটে যায়, কারণ বোধ আসে, জুজু-টুজু বলে কিছু নেই। জুজু-বিশ্বাস কেটে যায়।

ভূতের ভয়ও অনেকের কেটে যায়, দুই একজনের কাটে না। ভগবানে বিশ্বাসও কাটে না।

স্বনামধন্য এক সাহিত্যিক অকপটে বলেন, তিনি ভূতে বিশ্বাস করেন। অনেকে শুনে হাসেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেন। আমি বলি কি, উনি ওঁর যুক্তিতে ঠিক আছেন। ভগবান যদি থাকে, তাহলে ভূতও আছে,

আত্মা যদি থাকে, প্রেতাত্মাও আছে। কাজেই যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন, তাঁর ভূতে বিশ্বাস থাকাটাও খুবই জরুরি। ভগবান আছে, কিন্তু ভূত নেই, এই দ্বিচারিতা অন্তত আমাদের সেই স্বনামধন্য সাহিত্যিকের নেই।

আসলে দৈনন্দিন জীবনে, বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের যৌক্তিক চেতনা বলে ভূত-টুত কিছু নেই, কিন্তু

ভগবান-সংস্কারের অক্টোপাশ সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ভগবানভীতি কেটে গেলেও পাছে লোকে কিছু বলের সংকীর্ণতা ছেড়ে বেরোনো যায় না। দেখবেন মানুষ মুখে বলে ভগবানকে ভয় করে, ভক্তি করে, তবু যত অন্যায় দুর্নীতি করে এই ঈশ্বরমানা লোকেই।

একটি রূপক। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। দোকানে দেখার কোনো লোক নেই, ভগবান সব দেখছে! আরও লিখে দেওয়া হয়েছে, সঠিক মাল নিন। সঠিক দাম দিন। দোকানের প্রতিটি জিনিসের প্রতি তাঁর লক্ষ। খরিদ্দারসকল বেশ ভদ্রলোক, ধর্মপ্রাণ, অথচ দেখা গেল সব মাল শেষ, টাকার কাউন্টারে টাকা কেউ দেয় নি।এমনটি হলে, বলাই যায়, ব্যবসা ডকে উঠতে তার দেরী নাই।

কিন্তু যদি লেখা থাকে, আপনার গতিবিধির প্রত্যেকটি মুহুর্ত সিসিটিভিতে রেকর্ড হচ্ছে, দেখবেন মানুষ কত সৎ। ঠিক ঠিক জিনিস নিচ্ছেন, টাকাও দিচ্ছেন। বাস্তব জীবনে ভগবানভীতি না থাকলেও, সিসিটিভিভীতি আছেই। কারণ, এটি তাদের বিশ্বাসের ফলে নির্মিত সত্য নয়, বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

ধর্মান্ধ তথা ধার্মিকে বিশ্বাস করে তার সব কিছুর নিয়ন্তা হল তার ঈশ্বর। জন্ম মৃত্যু, বিবাহ সব কিছু তার ঈশ্বর ঠিক করেই রেখেছে, তার এতটুকু নড়চড় করার ক্ষমতা কারুর নেই। অথচ, এই ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার নমুনাও দেখবার মতো। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, বিপদ তথা ফাঁড়ার কথাও না কি গণনা করে জানা যায়। তা জানা যাক, গণনার ক্ষমতায় নির্ভুল এসব জেনেটেনে এবার যেটি করে

তা কিন্তু তাদের বিশ্বাসেরই পরিপন্থি। জ্যোতিষী তাদের ঈশ্বরের লিখনকে পাল্টে দিতে পারে। ছোট্ট একটা আঙটি ভগবানের লেখা ভাগ্যকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও তারা জ্যোতিষীকে, জ্যোতিষবিদ্যাকে, রত্নপাথরকে ঈশ্বরের ক্ষমতার চেয়েও শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে। দেখুন, কীরকম তাদের যৌক্তিকতা। একবার বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার ভাগ্যে বিপদ লিখেছে, দুঃখ লিখেছে। আবার জ্যোতিষী তার থেকেও শক্তিমান। আসলে এরা হল সুবিধাবাদী। লোভী। ভীত। স্বর্গের লোভে ঈশ্বর ঈশ্বর করে। মানুষের সাথে অন্যায় করে ক্ষমা চায় ঈশ্বরের কাছে। নরকের ভয়ে উপাসনা করে ঈশ্বরের। আবার কেউ গণনা-ফণনা করে তাকে ফাঁড়ার ভয় দেখালে শরণাপন্ন হয় তারই। সৌভাগ্যের লোভ দেখালে শরণাপন্ন হয় জ্যোতিষীরই। আসলে ধার্মিকের জীবনশৈলী গড়ে ওঠে এইরকম স্বার্থান্বেষিতায়। এরা তাই ধর্ম ছাড়া নৈতিকতার কথা ভাবতেই পারে না, ভাল কাজের জন্য ঈশ্বরের গিফটের বাইরেও কিছু চিন্তা করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে এদের শিক্ষা নেই। শিক্ষার পথও রুদ্ধ করে দিয়েছে ধর্মীয় জীবনশৈলী।

সূচিপত্র

শিশুমনে বিজ্ঞানমনস্কতা

লি খে ছে ন – রা জু দ ত্ত



মূলত তিনটি সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতার বিকাশে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের গুরুত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই রেনেসাঁর উদ্ভব। মানবসভ্যতাকে সুস্থ স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে, জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার

অত্যন্ত জরুরি। শৈশবেই শিশুমনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপণ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি মনোবিজ্ঞান বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দীর্ঘদিন শিশুদের সাথে থেকে, তাদের আচরণ বিশ্লেষণ করে আমি যা বুঝেছি, তার ভিত্তিতে তাদের মনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপণের চেষ্টা করে গেছি। সব ক্ষেত্রে না হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও পেয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমার সেই ব্যর্থতার দুটি কারণ উপলব্ধি করেছি। এক - আমার জ্ঞানের অস্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ও দুই - বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে অভিভাবকদের তীব্র বিরোধীতা।

শিশুরা অসম্ভব কৌতুহলী, আবেগপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা কম থাকায় ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা খুব সামান্য হওয়ায়, যে সকল ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে দুর্বোধ্য থাকে। তারা বড়োদের কাছে সেই সকল বিষয় নানারকম প্রশ্ন করে থাকে। বড়োরা তাদের প্রশ্নের সাধ্যমতো উত্তর দিলেও, অধিকাংশ সময় তারা প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যান। এতে শিশুর কৌতুহলের নিরসন তো হয়ই না, উপরন্তু, তাদের জিজ্ঞাসু মন ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে, ফলে একসময় তারা প্রশ্ন করতে অনীহা প্রকাশ করে। এতে তার মানসিক বিকাশ প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শিশুদের কৌতুহল নিরসন সবসময় সম্ভব হয়না। এর মূলত তিনটি কারণ। এক - প্রশ্নোল্লিখিত বিষয় আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, দুই - বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক এখনো সেই প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব হয়নি এবং তিন - অদ্ভুত, অবাস্তব বা হাস্যকর প্রশ্ন।

প্রথমোক্ত সমস্যা দূর করতে আমাদের নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানলাভের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সহজতম পদ্ধতি হলো, বই পড়া। আমাদের প্রচুর বই পড়তে হবে ও পঠিত সকল বিষয় স্বচ্ছ ধারনা গড়ে তোলার প্রয়োজনে উক্ত বিষয়গুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। বুঝতে না পারলে যিনি সেই বিষয় জানতে পারেন, তেমন কারও কাছে বিষয়টি বোঝার জন্য স্বচেষ্ট হতে হবে। গুগল মাধ্যমেও আমরা বিকল্প উপায় বহু বিষয় জ্ঞানলাভ করতে পারি। তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার, পঠিত সকল বিষয় যুক্তি দিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন। বইতে যা লেখা আছে তা অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা, শিশুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির সঠিক উত্তর অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক অজ্ঞাত থাকলে আপনি সেটা তাকে সরাসরি বলুন। বলুন যে এই বিষয় এখনো বৈজ্ঞানিকরা জানতে পারেননি। তবে জানার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। আপনি প্রশ্নটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো একটি প্রশ্ন তার মনে জাগিয়ে

তুলুন, যার উত্তর বিজ্ঞান জানে। শিশুর প্রশ্ন অদ্ভুত ও হাস্যকর হলে আপনিও আপনার রসবোধ ব্যবহার করে হাস্যকর উত্তর দিন। শিশুরা হাসতে ভালোবাসে। তবে একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, আপনি কখনোই শিশুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না। এতে শিশুর কৌতুহল বাধাপ্রাপ্ত হয়। যা একটি শিশুর মানসিক বিকাশের অন্তরায়।

শিশুমনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপণের কয়েকটি উপায় আমি উল্লেখ করছি। উল্লেখিত উপায়গুলি প্রয়োগ করে আমি বহুক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন।

(১) শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই কল্পনাপ্রবণ হয়। তাদের মনে কাল্পনিক প্রাণী, ডাইনি, জুজু, ভূতপ্রেত, ঈশ্বর জাতীয় অবাস্তব কল্পনার বীজ বপণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবেন না। বরং বিভিন্ন গাছপালা, জীবজন্তুর সাথে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটান।

(২) কার্টুন যথাসম্ভব কম দেখান তাদের। বরং তাদের দেখার উপযুক্ত শিক্ষামূলক সিনেমা দেখান। শিশুসাহিত্যিকদের রচনা পড়ান। তারা পড়ে মজা পাবে, তাদের পড়ার অভ্যাসটাও গড়ে উঠবে।

(৩) সূক্ষ্ম গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দিন।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সহজবোধ্য বিশ্লেষণ করে বোঝান। বিভিন্ন ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হাতে কলমে করে দেখান।

(৪) মাঠে খেলাধুলা করতে উৎসাহিত করুন। এর ফলে অন্যান্য শিশুদের সাথে তার ভাবের আদানপ্রদান গড়ে উঠবে। যা তার মানসিক বিকাশের সহায়ক হবে। দাবা খেলান। দাবার চালে তার ভুলগুলি সহজবোধ্য করে বোঝান। শিশু বলে তাকে জিতিয়ে দেবেন না।

(৫) শিশুর যুক্তি দিয়েই তার অযৌক্তিক ভাবনার অবসান ঘটান। এর ফলে সে একজন তার্কিক হয়ে উঠবে। যুক্তির পাল্টা যুক্তি দিতে শিখবে। কারণ সে সবসময় চাইবে তার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। আপনিও তা ভাঙার চেষ্টা করে যাবেন (তা যদি অযৌক্তিক হয়) এই দ্বন্দ্ব তাকে তার্কিক করে তুলবে। মনে রাখবেন যুক্তিবাদী হতে হলে তর্ক করতে শিখতে হবে।

পরিশেষে বলি, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটানো কোনো তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয়। অসীম ধৈর্য্যের সাথে আপনাকে কাজটি করতে হবে। শিশুদের মনে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে অপেক্ষাকৃত অধিক ধৈর্য্য প্রয়োজন হয়। ওদের মন যে বড়োই চঞ্চল। তার নাগাল পাওয়া সহজ নাকি!

সূচিপত্র

ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রভিত্তিক চৌর্যবৃত্তি কবে বন্ধ হবে?

লি খে ছে ন – শ ম্ভু না থ চা র্বা ক



বিখ্যাত সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর মস্কো থেকে পন্ডিচেরির ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে লেখা দিয়েই শুরু করি - আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে অর্থচিন্তার কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন --- একাধারে যেমন বেদ উপনিষদ, গীতা যা মান্যতা দেয় শূদ্র ও নারীদের দাবিয়ে রাখার জটিল তত্ত্ব আর অন্যধারে অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর শূদ্র শ্রেণীর মানুষকে দাবিয়ে রাখার প্রত্যক্ষ ধর্মের গ্রন্থ মনুসংহিতা। এই দাবিয়ে রাখতে গিয়েই বিভিন্ন জটিল ধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই ব্রাহ্মণদের আয়ের ব্যবস্থা বা এক কথায় বলা যায়

শাস্ত্রানুসারী চৌর্য্যবৃত্তি। ব্যক্তি নির্বিশেষে জন্মের আগেই সাধ থেকে শুরু করে ছয় ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, বেচারার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ট্যাক্সো আদায়, এমন কি, বহুকাল আগে খতম হয়ে গেলেও তার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নেড়া মাথার ওপর বংশানুক্রমে বাৎসরিকের মাধ্যমেই জিজিয়া এবং এছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্বন গৃহ প্রবেশ দোকান শুরুর পুজোতো আছেই। দুর্গ্রহক্রমে এই ভূগ্রহে জন্মাবার ও মরবার পাপের শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত আমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মূলধন বিহীন চিরকেলে ব্যবসা, একদম বিনা পুঁজির ফলাও কারবার। অর্থনীতিতে সেই সময়ে নোবেল পুরস্কার থাকলে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের অনেকেই এই পুরস্কার পেতেন। ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট মিল; অ্যাডাম স্মিথ বা লর্ড কেইনসও ভাবতে পারেননি এই রকম হরেক ট্যাক্সের কথা

কয়েক দিন আগে এক ছাত্রের মায়ের শ্রাদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। শ্রাদ্ধবাড়িতে যাই না এবং যাওয়া ভীষণভাবে অপছন্দ করি। নিজের মা – বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিনি, সাদা কাপড় পরিধান করিনি, চুল কাটিনি, এক এক কথায় কিছুই করিনি, এই জন্য পাড়ায় আমার বেশ বদনাম আছে নাস্তিক হিসেবে। যে মানুষের মৃত্যুর আগে তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারিনি তার শ্রাদ্ধে কবজি ডুবিয়ে খেয়ে এসে সেটা সম্পর্কে গল্প করতে খারাপ লাগে তাই ছাত্রদের বলে দিয়েছিলাম যেতে পারি কিন্তু কিছু

মুখে দেবো না। কিছু কিছু জায়গায় যেতেই হয় তাদের মান এবং মন রক্ষার্থে। যে বাড়িতে গিয়েছিলাম তারা তিন ভাইই আমার পূর্বতন ছাত্র এবং প্রায়ই বাড়ির দোরগোড়ায় থাকে ফলে যেতে একপ্রকার বাধ্যই হয়েছিলাম। তাদের বাবা নেই, মা দীর্ঘদিন ধরে বিছানায় ছিলেন। ভাইয়েরা মিলে রান্না করে মায়ের শুশ্রূষা করেছে বছর তিনেক ধরে। কাজকর্মও সেভাবে কিছু করে না, বড়জন সম্পূর্ণ বেকার, মেজোর একটা অটো আছে লিজে দেওয়া, শুধুমাত্র ছোটটি একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। মাঝে মধ্যে দু একবার দেখতে যাওয়া ও মা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা ও আহা উহু করা ছাড়া আর কিছু সাহায্য তাদের করিনি। অথচ শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে। আমার বাড়ির লোক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাওয়া পছন্দ করে না। তারা কেউ যাবে না অগত্যা আমাকেই শ্রাদ্ধের দিন ফুল মালা ধূপকাঠি হাতে দেখা করতে যেতে হল। শ্রাদ্ধের দিন পুরোহিত মহাশয় দুজন দিয়ে শ্রাদ্ধ করানো হয়েছে। সেদিনও দুশো লোক খেয়েছে এবং নিয়মভঙ্গের দিন প্রায় পাঁচশো লোক নিমন্ত্রিত। তাকে শ্রাদ্ধের আগে ঠারেঠুরে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি শ্রাদ্ধ ব্যাপারটির কোনো যৌক্তিকতা নেই, মরার পর মানুষের স্মৃতি আর কাজ ছাড়া কিছুই থাকে না। তোরা মায়ের জন্য যা যা করেছিস এই কবছরে তার থেকে বেশী পুণ্য আর কিছু নেই, এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অপরের মাথায় টাক দিয়ে

খাওয়ার ব্যবস্থা। কে কবে দেখেছে মৃত ব্যক্তি খেতে আসে? আদিম অজ্ঞ মানুষের ভয় ও বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে পুরোহিতেরা নিজেদের আয়ের ব্যবস্থা করেছে। এগুলি ধর্ম নয় এগুলি অধর্ম, ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত হিন্দুদের কু-আচার। পুনর্জন্ম বা পরলোক বলে কিছু নেই, মানুষ প্রকৃতি পরিবেশের সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর সব প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। পুরোহিত শ্রেণি মানুষকে ভয় দেখিয়ে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা করে, যেমন -

১) জন্মের আগে সাধ ও ছয়দিনে ছয় ষষ্ঠী

২) অন্নপ্রাশন

৩) বিবাহ

৪) মৃত্যু

৫) মরার পরও ছাড় নেই, তার পুত্র প্রপৌত্রদের থেকে বাৎসরিকের নামে চাঁদা আদায় করে।

কিন্তু আমার ছাত্ররা এতো কুসংস্কারগ্রস্থ পরিবারে মানুষ হয়েছে যে তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝানো খুব কঠিন। যাইহোক আমাকে তারা পাড়ার লজে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি রুই মাছ এবং বিশাল বিশাল পাবদা মাছ পটল চিংড়ির ব্যবস্থা ছাড়াও মিষ্টি আইসক্রিমের ব্যবস্থা আছে। আমাকে প্রায় জোর করেই খেতে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল। আমি পরিষ্কার জানালাম পেট

পুরে খেয়ে এসেছি কোনোমতেই খেতে পারবো না। তখন ওরা বসতে বলল এবং কিছুক্ষণ থাকতে অনুরোধ করল। সেখানে বসে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের সাথে আলোচনা করছিলাম রামায়ণের দশরথের পুরোহিত জাবালির কথা। সেই যুগের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এর বিরুদ্ধে জাবালি প্রতিবাদ করেছিল। বুঝলাম আমাদের সমাজের শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন না হলে এই ব্যবস্থা চলতে থাকবে। এই মৃত্যুভোজ কবে বন্ধ হবে জানিনা?

এইসব অনুষ্ঠানগুলি কবে যে মানুষ বাদ দেবে জানি না।



আকৃতি ।Photo Credit: Harivara

ঐ ছেলে তিনটির তেমন আয় নেই। বাবার জমানো যা পুঁজি ছিল তা বোধ হয় মায়ের শ্রাদ্ধে শেষ করেছে। এরপর কি হবে? এইসব ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পেট ভরার অনুষ্ঠান মানুষকে ধনেপ্রাণে শেষ করে। বর্তমান দিনের অল্প কিছু আধুনিক সৎ ব্রাহ্মণ পদবিধারীদের এই অনুষ্ঠানকে ঘৃণা করে দেখেছি। নিজেরা এই অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকে।

আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত যুক্তিবাদী মনে করি তারাতো এই অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করতে পারি নিজেদের জীবন থেকে! সমস্ত পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বিসর্জন দিতে পারি। জন্ম মানুষের জীবনে এক দুর্ঘটনার মতো, ৩০ - ৩৫ কোটি শুক্রানু লড়াই করে একটা বাঁচে, সেটাই মানুষ হয়, কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। জন্ম যেমন প্রকৃতি উদ্ভুত তেমন মরার পর সে পোড়াও বা কবরে দাও সবই প্রকৃতিতে ফিরে যায়। তখন স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকেনা, যাকে অনেকে আত্মা বলে। আর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান না করে শ্রদ্ধানুষ্ঠান স্মরণসভা করতে পারি! এতে মৃতের প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা জানানো হয় আবার ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রানুযায়ী চৌর্যবৃত্তিকে প্রতিরোধ করাও যায়।

"বেদ,বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতির মধ্যে কোনো সত্য নেই । সত্যকে অর্জন করতে গেলে বিজ্ঞান চাই যুক্তি চাই।"

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সূচিপত্র

মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান

লিখেছেন – জাহিদ রুদ্র



(১)

"আমি শাহবানু মুসলিম মেয়ে, তবু ইসলাম আমাকে দেখে না! আমার জন্য হাদিস কেউ না, শরিয়ত তুমি এত নিষ্ঠুর"

পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় পরিবারতন্ত্রে - আর নারীকে শৃঙ্খলিত রাখার মধ্যে তার বিস্তার। নারী জন্মসূত্রে অবলা, পুরুষের পর জন্মেছিল নারী। উত্তরাধিকার উৎপাদনে নারী গণ্ডিবদ্ধ গৃহজীবনে হয়ে ওঠে পরিচারিকা। সমান অধিকার যে নারীর স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্য এবং কোনোভাবেই তা পুরুষের দেওয়ার জিনিস নয়, এই সারসত্যটা আমাদের সমাজ এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। উপরন্তু নারীকে বোঝানো হয়েছে পুরুষের আজ্ঞাবাহী হওয়াটা তাদের অবশ্যকর্তব্য। ঘরের কাজ-বাইরের কাজ, এই শ্রেণিবিভাগটাও একান্তভাবেই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার ফসল। তবে এই প্রপোগেণ্ডা এখন মিথে পরিণত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মনে করে যে, তারা নারীকে সমান অধিকার দিয়ে থাকে। এবং একই সাথে কয়েক হাজার বছর ধরে মেয়েদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে যে, তারা আদতে 'ইনফিরিয়র ক্লাস' এবং পুরুষের আজ্ঞাবাহী হওয়াটা তাদের অবশ্যকর্তব্য। ধর্ম থেকে সামাজিক জীবন, যাবতীয় শেকল মেয়েদের জন্যই সৃষ্টি। ঘরের কাজ-বাইরের কাজ, এই শ্রেণিবিভাগটাও একান্তভাবেই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার ফসল।

ভারতবর্ষের সামাজিক, জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক আন্দোলন এসে মিশেছিল নারী প্রগতি আন্দোলনের মোহনায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষে মহিলাদের

অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় না। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই বঞ্চনা মিটিয়ে কীভাবে মেয়েদের সমান অধিকার দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে তা নিয়ে



বিস্তর আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের ডামাডোলে প্রতি এগারো মিনিটে একজন মহিলা খুন হচ্ছেন নিজের ইন্টিমেট পার্টনার অর্থাৎ স্বামী, বাবা, ভাই দ্বারা। হচ্ছে কন্যা ভ্রূণ হত্যাও। ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান দলিত আর সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম মহিলারা।

মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থার অবনতি হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১) থেকে সিকান্দার লোদীর (১৪৮৯-১৫৭৭) সময়কালে। কারণ নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়ার স্বাধীনতাও ছিল না, এমনকি বোরখা ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একদা 'অবাঙালি মুসলমানদের পোশাক' বলে চিহ্নিত যে আচ্ছাদন আপামর বাঙালি মুসলিম মেয়েদের কাছে ব্রাত্য ছিল – সেই হিজাব, বোরখার 'বাঙালি' দোকান এখন গজিয়ে উঠেছে। কারণ হিসাবে মূলত দুটো মত উঠে আসে – প্রথমত ধর্মীয় ভক্তিরসের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়ত পশ্চিমা ফ্যাশনের সাথে পশ্চিম-বিরোধী ইসলামিক সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা। মূলত পাশ্চাত্যে উদ্ভূত ব্যক্তিস্বাধীনতাকামী ও নারীবাদী স্লোগান 'মাই বডি-মাই চয়েস' -কে বুমেরাঙের মত ব্যবহার করছে এই পর্দাসীন মেয়েরা।

নিজস্ব ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে থাকার জন্য মুসলিম কম্যুনিটিতে মেয়েদের অবস্থার প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি এখনও। মুসলমান মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ খুঁজতে গেলে ভিতরে ও বাইরে - অর্থাৎ তাদের পরিবারের ভিতরে ও সমাজে – দু জায়গাতেই দৃষ্টি দিতে হবে। মুসলমানদের বেশিরভাগই গ্রামে বসবাস করায়, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতোই মুসলমান মহিলারা সকল রকম সুযোগ-সুবিধা

থেকে বঞ্চিত হয়। চাষবাস বা অন্যান্য শারীরিক শ্রমনির্ভর জীবিকা, সাক্ষরতার নীচু হার ও দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবার কারণে মুসলমানদের মধ্যে নানা বিষয়ে অক্ষমতা দেখা দেয় ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। নিজ সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা, অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। বাড়ির মেয়েরা পড়াশুনা বা কাজের জন্য বাইরে যাবে কেন- এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকে। এই কারণেই বহু মুসলিম কিশোরীর অসম্ভব প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় মুসলমান পরিবার গুলোতে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। ফলে শিশুরাই শিশুর মা হয়ে যাচ্ছে। শারীরিক গঠন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে মা ও শিশু কারোরই পুষ্টি ঠিকঠাক হয় না এবং তারা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। জাস্টিস রাজিন্দার সাচারের নেতৃত্বাধীন কমিটি ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে কিছু নগ্ন সত্য বেরিয়ে আসে। ৬-১৪ বছর বয়সী বাচ্চাদের গ্রুপে ২৫% মুসলিম শিশু স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়। মাত্র ১৭% মাধ্যমিক পাশ করে। সরকারি স্কুল রিপোর্টকার্ড (২০১৪-১৫) অনুযায়ী, গড়পড়তা ৫০% মুসলিম মহিলা স্কুলে গিয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় -- ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভের মধ্যে প্রায় ৪০% মুসলিম মেয়ে স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়। এবং এই

ড্রপ আউট সবচেয়ে বেশি হয় মাধ্যমিকের পর। অর্থাৎ, মাধ্যমিক পাশ করার পর অধিকাংশ মুসলিম মেয়ে আর পড়ার সুযোগ পায় না।

২০১১-এর সেন্সাস অনুযায়ী, আমাদের দেশে ১৪.২৩% মানুষ ইসলাম ধর্মের। এর আগে সাচার কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় মুসলিমদের ৩১% পভার্টি লাইনের নিচে বাস করে। মোট মুসলিম কম্যুনিটির ৪৮% হল মহিলা আর সেন্সাস ২০১১-তে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের ৪৮.১১% নিরক্ষর। অর্থাৎ প্রায় চার কোটির বেশি ভারতীয় মুসলিম মহিলা নিজের নামটাও লিখতে পারেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থান মোটেই উল্লেখ্য নয়।

২০০৪-০৫ সালে সাচার কমিটি রিপোর্ট মতে, মোট জনসংখ্যার ৪.৪% মুসলিম যুবক গ্রাজুয়েশন পড়তে যায়। ২০০৯-১০ সালের স্যাম্পল সার্ভেতে সংখ্যাটা একটু বেড়ে হয় ১১%। ২০১৩-১৪-তে উচ্চশিক্ষায় মুসলিম যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ বেড়ে হয় ১৮% এবং ২০১৮-তে তা ৩৭%-এ দাঁড়িয়েছে। এটা খুব স্বাভাবিক একজন অশিক্ষিত এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন না। ইউনেস্কো EMPOWERMENT-এর সংজ্ঞা দিচ্ছে, "... the

expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives."। অর্থাৎ, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একজন মানুষের ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার পদ্ধতিটাকেই আমরা এমপাওয়ারমেন্ট বলছি। মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটি আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে মহিলারা সবরকম অত্যাচার আর বঞ্চনার হাত থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের মত বাঁচতে পারবেন।

আমাদের দেশে যেখানে মেয়েদের পায়ে শেকল বেঁধে রাখাটাই দস্তুর সেখানে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের মত স্বাধীন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করাটা অবশ্যই খুব শক্ত কাজ।আর্টিকেল ১৫-তে বলা হয়েছে যে, সরকার লিঙ্গের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য করতে পারবে না। আর্টিকেল ১৫ (A) আর (E)-তে মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণকে শাস্তির আওতায় ফেলা হয়েছে। ২০০১ সালে National Policy for The Empowerment of Women বিলটি পাশ করানো হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের ২০০০ সালের রিপোর্টে শহর এলাকায় ৬.০৩% আর গ্রামে মাত্র ১.২২% গ্রাজুয়েট

মুসলিম মহিলা পাওয়া গিয়েছিল। তবে গত দেড় দশকে এই অবস্থার খানিক হলেও পরিবর্তন ঘটেছে। All India Survey on Higher Education (২০১৭-১৮)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত পাঁচ বছর উচ্চশিক্ষায় মুসলিম মহিলাদের এনরোলমেন্ট বেড়েছে ৪৬%, যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

(২)

সার্বিকভাবে মুসলিম নারীর লেখাপড়ার সুযোগ বেড়ে গেলেও শরিয়ত, পর্দা ও ধর্মীয় কুসংস্কারে মুসলিম নারী এখনও পুরুষতন্ত্রের গেঁড়াকলে। সেই জায়গা থেকে বেগম রোকেয়ার কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল সত্য। পিছিয়ে থাকা নারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি তার বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তমসাবৃত অবস্থা থেকে আলোর অভিমুখী করেছিলেন নারীকে। তাই প্রগতি চেতনার দিশারী, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া প্রথমেই বিদ্রোহ করেন পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর তাঁর লেখনী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ‘ধারাবাহিক ধর্মযুদ্ধ’। মুসলিম সমাজে নারী জাগরণে, সমস্ত প্রগতিশীল ভাবনার এক সংহত রূপ সংগ্রামী নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মধারায় প্রকাশ পেয়েছে।

'ইসলামে নারী হল মূর্তিমতী কাম। যে নারী একদিন তাকে করেছিল স্বর্গভ্রষ্ট, লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে, তাই তাকে অর্থ্যাৎ নারীকে ইসলাম ক্ষমা করেনি কোনদিন। কোরানের চতুর্থ সুরা- 'সুরা নিসা'। 'নিসা' শব্দের অর্থ নারী। সুরার নামকরণ থেকে বোঝা যায় এখানে নারীর বিধি-বিধান-নির্দেশ উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে নারীর সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদিও তা যৎসামান্য। এই সুরা যদিও নারীর জন্য রচিত তবুও কিন্তু এখানেও কোরানের স্রষ্টা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে--- "পুরুষ নারীর রক্ষা কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে।"(সুরা নিসা, ৪/৩৪)

আবার বলা হয়েছে - "নারীদের পরিচালক হচ্ছে পুরুষরাই। কারণ, আল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যের উপরে মর্যাদা দান করেছেন। (সুরা নিসা, ৬/৩৪)

ইসলাম ধর্ম পুরুষকে করেছে বহুভোগ্যা। সুরা নিসার প্রথমে আল্লাহ বলে দিলেন -- "তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভবনা বেশি।" (সুরা নিসা, ৪/৩) এমনকি নারী অবাধ্য হলে তাকে প্রহার করার কথাও কোরানে বলা হয়েছে --

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভাল করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেওনা ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ খুঁজবে না।" (সুরা নিসা ৪/৩)

যদিও আবার অনেকে মনে করেন - "ইসলামই প্রথম ঘোষণা করল, পুরুষের ন্যায় নারী জাতিরও আছে স্বাধীনতার অধিকার, মুক্তির অধিকার। শিশু কন্যার আছে বাঁচার অধিকার। বিধবার আছে বিবাহ করার পূর্ণ অধিকার। কুমারীর আছে স্বামী পছন্দের সম অধিকার। পুরুষের ন্যায় মহিলারও আছে বিবাহবিচ্ছেদে সমান দাবী। আইনের সম অধিকার। পাপ ও পুণ্যের সম অধিকার। আরধনা ইবাদতে সম অধিকার। শিক্ষাতে সম অধিকার। নারী মনুষ্য সমাজের অর্ধেক, তার দাবিও অর্ধেক। এই পৃথিবীতে পুরুষের প্রয়োজন যতটা, নারীর দরকারও ততটাই। একটি পরিবারের এক পা, এক হাত, এক চোখ, এক কান যুবকের, দ্বিতীয় গুলোর মালিক যুবতী। ইসলাম ঘোষণা করল, এই পৃথিবীতের সমস্ত কিছুতেই নারীর প্রকৃতিগত, প্রবৃত্তিগত, স্বভাবগত, এবং যা কিছুই তার সহজাত, সর্বস্থানেই পুরুষের সঙ্গে তার সম অধিকার আছে। সমগ্র মানবমন্ডলীর অর্ধাংশকে প্রথম মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিল কে, ইসলাম।পুরুষের পুংলিঙ্গের নিকট নারীর

স্ত্রী লিঙ্গ তো কোনদিনই লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কেবল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইসলামই তাকে সম-স্থান, সমসম্মান দিল।"

আরব্য রজনীর অংসখ্য উপাখ্যানে দেখা যায় পুরুষ এক নারী থেকে অন্য নারীতে ছুটেছে, এক নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি- যাকে ইসলাম আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামের কাছে বিয়ে একটা অসম চুক্তি, একটা প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর জন্য একজন মুসলমান পুরুষ চারজন বৈধ স্ত্রী রাখার পরও যৌন সম্ভোগের জন্য যত খুশী দাসীকে সম্ভোগ করতে পারে, তাতে ইসলামী আইনে বা নৈতিকতায় কোন বাধা নেই। দাসী সম্ভোগ ইসলামে বৈধ। বিয়ে সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন -- ‘‘ইসলামি আইনে বিয়ের চুক্তি মালিক-শ্রমিকের চুক্তির থেকেও ভয়াবহ ও শোষণমূলক, কেননা ওখানে চুক্তি করে’ই একজনকে দেয়া হয় অশেষ অধিকার এবং আরেকজনের প্রায় সমস্ত অধিকার বাতিল হয় কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে। ইসলামি আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী, যে স্বামীকে দেবে যৌনতৃপ্তি ও বৈধ সন্তান। কিন্তু স্বামী যখন ইচ্ছে মনের খেয়ালে শুধু তিনবার ‘তালাক’ বলে ছেড়ে দিতে পারবে তাকে। চুক্তির কথা বলা হলেও ইসলামি বিয়েতে পুরুষ ও নারীটি চুক্তিতে আসে না, চুক্তিতে আসে পুরুষ ও নারীর অভিভাবক।’’

আবার তিনি বলেছেন - ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা চিরস্থায়ী নয়, যে-কোনো সময় স্বামী তা বাতিল করতে পারে। তালাক মুসলমান নারীর জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ, ওই বজ্র যে- কোনো সময় নীলাকাশ থেকে তার মাথায় এসে ফাটতে পারে। মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম একটিও করতে পারে। পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয় না, শুধু দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক-দুই-তিন করে তালাক দেয়া।



মুসলমান পুরুষের জন্যে তার চারটি স্ত্রী সম্ভোগই শুধু বৈধ নয়, সে তার ক্রীতদাসীদের সাথেও সঙ্গম করতে অধিকারী।’

(৩)

'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে'। অর্থাৎ জৈবিকভাবে একটা শিশু স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায়

এটুকুই প্রাকৃতিক সত্য। একটা শিশু কি জানে জন্মলগ্ন থেকে সে নারী না পুরুষ। পদে পদে তাকে হিজাব পরিয়ে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটি ধরিয়ে দিয়ে, মেকআপ দিয়ে, খোলা আকাশ থেকে সরিয়ে ঘরে বন্ধ করে, সামাজিকভাবে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয়। “ধর্ম মেয়েদের চিরকালের শত্রু। ধর্ম মেয়েদের শেকল পরায়। আমি কথামানবী স্বহস্তে ঈশ্বরের পূজা করতে গেলাম, ধর্ম বলল, পূজা পুরুষের অধিকার, ব্রাহ্মণ পুরুষের। আমি প্রতিবাদ করলাম, ধর্মের কবি তুলসীদাস বললেন, ‘ঢোল গাঁওয়ার শূদ্র পশু নারী ইয়ে সব হ্যায় তাড়নকে অধিকারী’ পুরুষ তালাক দিলে আমি খোরপোশ চাইলাম, ধর্ম বলল আল্লা নারীর খোরপোশের বিধান দেয়নি, আপনারা বলুন, কথামানবী কী করবে? কী করবে শাহবানু?” মিরান্ডা ডেভিজ তাঁর 'Thirdworld Women : Second Sex' বইয়ে যথার্থই লিখেছেন, “As they begin to recognise and identify the specific nature of their double oppression many women in the third world realise that when needed they may join the guerrila movement, participate in the economy, enter politics and organise trade unions, but at the end of the day they are still seen as women, second class citizens, inferior to men, bearers of children and domestic servants.”

কাজি নজরুল লিখেছেন, ‘আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই’। মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটা বড় সমস্যা হল সম্পত্তির সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। শরিয়তে বলা আছে ছেলে আর মেয়ে কখনই সম্পত্তির সমান অধিকার পাবে না। ছেলেদের থেকে মেয়েরা কম পাবে। আর আজকের এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও এই নিয়ম মানা হচ্ছে। 'আমি আমার দাদা, ভাইয়ের মত পড়াশোনা শিখেছি, কষ্ট করে বাইরে গিয়ে পড়েছি, হয়তো চাকরির তাগিদে আর পাঁচটা ছেলের মতোই বাইরে গিয়ে কষ্ট করে টিকে থাকার জন্য লড়াই করবো। অন্য ছেলেদের মতো সংসারের হাল ধরবো, আমার মা বাবাও হয়তো গর্ব করে অথবা চোখের জল (খুশির) ফেলে বলবে আমার মেয়ে, ছেলের থেকে একটুও কম না। পাড়া প্রতিবেশী সবাই বলবে ছেলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে ওই মেয়ে। ও কম কি! কিন্তু সম্পত্তি ভাগের সময় তখন যে প্রমাণ করে ছাড়ে, হ্যাঁ মেয়ে তুমি কম। কম বলেই আমার সমান অধিকার নেই আমার নিজের বাড়িতে, নিজের সম্পত্তিতে। আমার মা বাবা যতই বলুন আমরা ছেলে মেয়ের ভেদাভেদ করি না কিন্তু ছেলে-মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করতে গিয়ে সেই শরিয়তের প্রসঙ্গ তুলবে' (শাম্মী বিশ্বাস)। আজ মানুষের মানবিকতা কোথায় হারিয়েছে! হাদিসের অজুহাত দেখিয়ে যে নিয়ম

চালু রেখেছে,শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের প্রতি বঞ্চনা কি চলতে দেওয়া যায়?

নজরুল দুঃখ করে বলেছিলেন:

‘বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে

আমরা তখন বসে,

বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি

ফেকাহ হাদিস চষে।’

ইসলামের সর্বশক্তিমান আল্লাহ পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের জন্মলগ্নে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল- তা কিন্তু পরবর্তীকালে আর থাকেনি। ইসলামের বিজয়রথ যতই এগিয়েছে পুরুষরা নারীর অধিকারকে করেছে পদানত, করেছে বন্দী আর পরিণত করেছে হারেমে। এর ফলে নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কামনার বস্তু। হয়ে উঠেছে ফিতনা- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময়ে নারীকে তারা বহন করেছে সাথে, কিন্তু তা একান্তভাবে উপভোগের জন্য। পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য আর দৈহিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। মুসলিম পুরুষের উত্তরাধিকার আরব পুরুষ যারা সম্ভোগ পরায়ন।

স্বয়ং এঙ্গেলস মার্কসবাদের সূত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন --- "That woman was the slave of man at the

commencement of society is one of the most absurd notions that have come down to us from the period of Enlightenment of the 18th Century."যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের নারীর সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে প্রায় সমস্ত চিত্রটাই এক। হয়তো সামান্য কিছু ব্যতিক্রম নজরে আসে।

কিন্তু নারীর নারী হওয়া, তাকে মানুষ না ভাবা কিংবা নারীর অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ বা অবস্থান, পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকারের প্রশ্ন উঠলেই ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদেরকে সমাজের নীচুতলার বাসিন্দা করে রাখা হয়েছে। যে সমাজের কথাই বলি না কেন প্রত্যেক সমাজেই নারীকে হীন চোখে দেখা হয়েছে। নারীকে নারী করেই রাখা হয়েছে, মানুষ হতে দেয়নি। মানুষ তৈরীর আঁতুড় ঘরে যে শিক্ষা, অর্থনীতি- সব কিছু থেকে তাদেরকে করেছে বঞ্চিত। তাই বলতে দ্বিধা নেই এই যে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক তা গড়ে উঠেছে

স্বাভাবিক প্রেমের তাগিদে নয়, সংসারের তথা সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

তথ্যসূত্রঃ
১) https://www.census2011.co.in/religion.php
২) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sachar_Committee
৩) https://sksew.com/welcome/singlepost/muslim-women-education-patriarchy-india
৪) তদেব, মেধাজন্ম, কথামানবী, তদেব, পৃষ্ঠা–১০২
৫) তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪–১০৫
৬) ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান, পৃঃ ৩৩–৩৮

৭) হুমায়ূন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী
৮) ফরহাদ মজহার, বোরখা, এবাদতনামা
৯) Miranda Davies, Third World, Second Sex Woman's Struggles and National Liberation
১০) Friedrich Engels Origin of the Family, Private Property, and the State, March-May, 1884

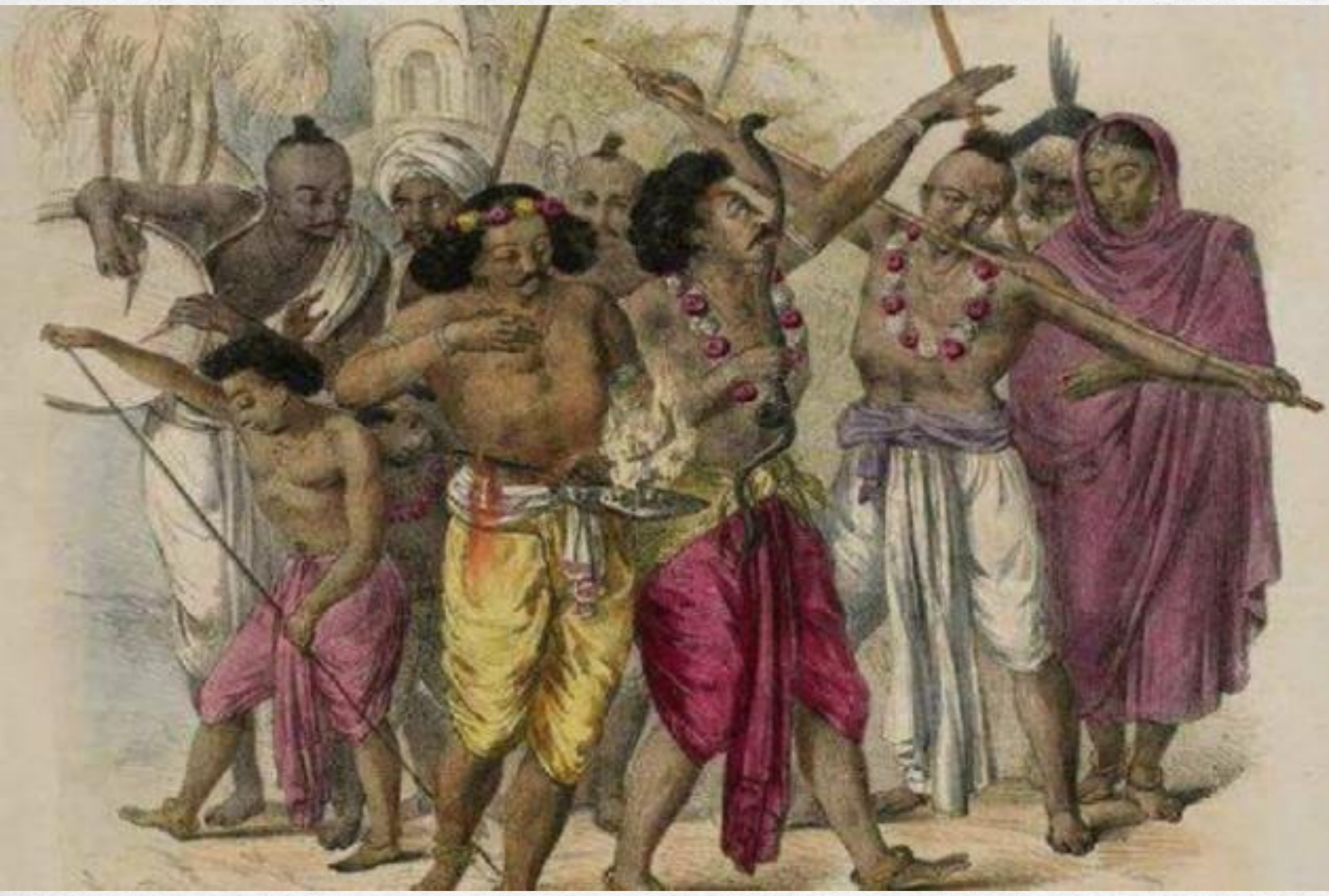
দুনিয়ায় কাউকেও দীর্ঘ সময়ের জন্য মূর্খ বানিয়ে রাখা যায় না । কিন্তু ধর্ম এমন একটা জিনিস যা মানুষকে বংশ পরম্পরায় গোলাম বানিয়ে রাখে।

- আব্রাহাম লিঙ্কন

সূচিপত্র

অপবিজ্ঞানের চাষাবাদ (চড়ক পূজা)

লি খে ছে ন – নি র্ম ল



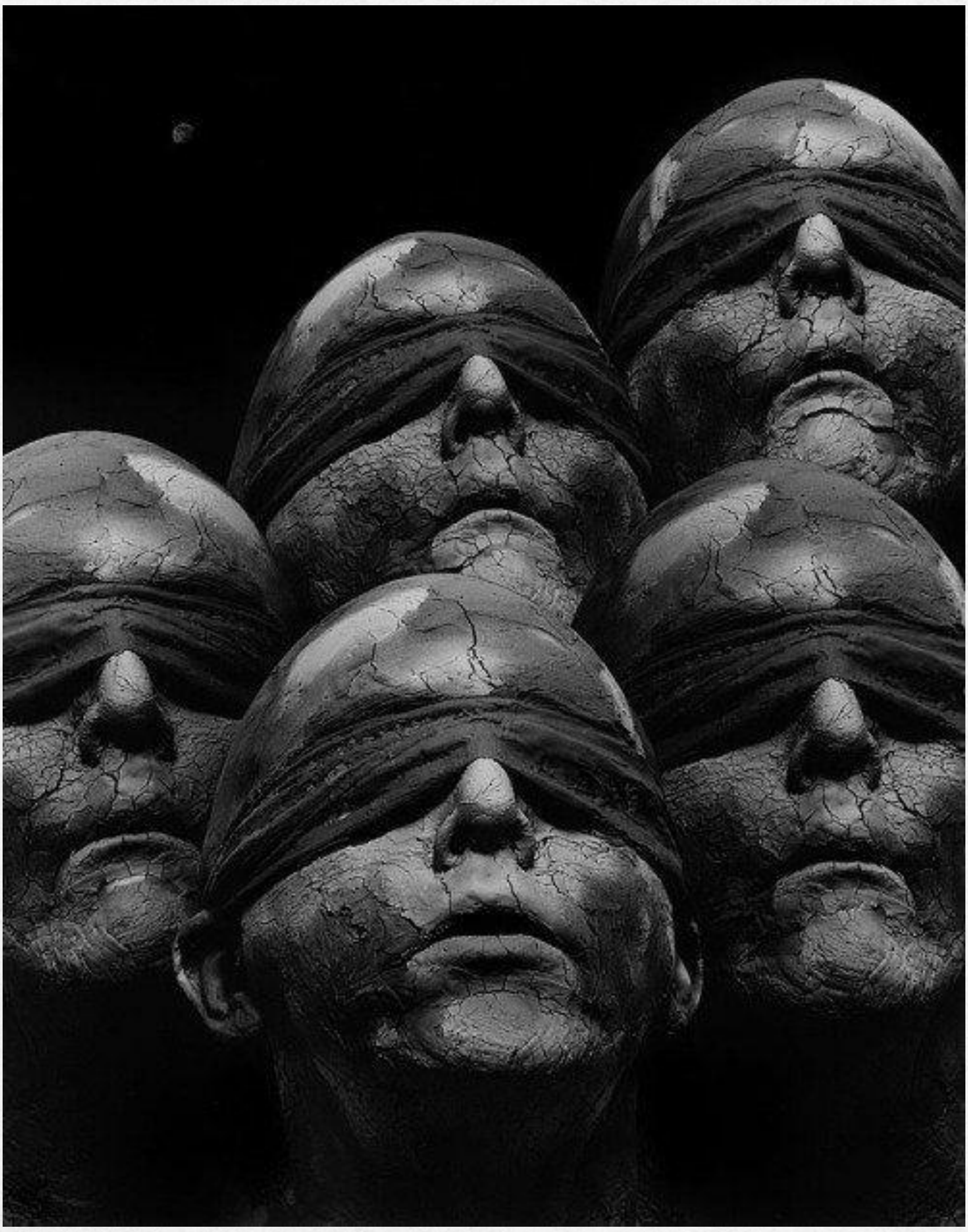
সাধারণত হার্ডকোর শহরাঞ্চলে চড়ক বা নীল পূজার (স্থান ভেদে গম্ভীরা শিবের গাজন বিভিন্ন নামে পরিচিত) তেমন প্রচলন না থাকলেও আজও বাংলার শহর অঞ্চলের আশেপাশে বা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে রমরমিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। জনশ্রুতি আছে ১৪৮৫ সালে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা দেবতা শিবকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই পূজার প্রথম শুরু করে।

আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি তারা ছোটবেলা থেকে এই উৎসব দেখে আসছি। উৎসবের অংশ হিসাবে প্রায় এক মাস ধরে লাল কাপড় পরিধান করে সন্ন্যাস নিয়ে বিভিন্ন নিয়মকানুন মানতে হয়। চৈত্রের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয় নীল পূজা। পূজার অংশ হিসেবে চৈত্রের শেষ দিন সন্ন্যাসীদের জ্বলন্ত কয়লার উপর হাটা, মানুষের খুলি নিয়ে নাচ, খেজুর কাটার উপর লাফানো, ধারালো অস্ত্রের উপর দাঁড়ানো এমন বিভিন্ন বিপদজনক কসরত দেখাতে হয়। তবে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কসরত লোহার বরশি পিঠে ঢুকিয়ে চড়ক গাছে বেঁধে পাই পাই করে ঘোরানো, হাতে পায়ে, জিহ্বায়, গালে লোহার শলাকা ঢুকিয়ে প্রদর্শন করা।



যেখানে ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার এই নিকৃষ্ট ধর্মীয় আচরণ আইন করে বন্ধ করার চেষ্টা চালায় সেখানে আজও ২০২২ সালে এর রমরমা চোখে পড়ার মতো।

আজ থেকে কিছু বছর আগেও আমরা দেখেছি কিছু নির্দিষ্ট মানুষ (১৫ থেকে ২০ জন) প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠান করত। কিন্তু অবাক করার মত ব্যাপার কয়েকবছর ধরে দেখছি এর এক একটি দলের লোক সংখ্যা প্রায় একশ থেকে দেড়শ জন হয়ে গেছে। এদের বেশির ভাগেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে এমনকি ১০ বছরের নিচের বহু শিশুদেরও সন্ন্যাস নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে



মাসখানেক ধরে শিশু-কিশোরদের মনে ভুত-প্রেত ও পুনর্জন্মবাদের চাষ করা হয়। পড়াশোনা, স্কুল সব বাদ দিয়ে একদল (আগে শুধু কিশোর এখন কিশোরীদেরও দেখা যায়), শিশু সারা মাস ধরে ঘরবাড়ি ছেড়ে মোবাইল

হাতে অপবিজ্ঞানের পাট নিচ্ছে, সঙ্গে মুক্তভাবে নেশা ভাং এর সুযোগ।

ব্রিটিশ সরকার যে ধর্মীয় আচরণকে নিকৃষ্ট ধর্মীয় আচরণ হিসাবে বন্ধ করতে চেয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক কারবারীদের দৌলতে তা আবার ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। এ কোন সংস্কৃতির দিকে সমাজ এগিয়ে চলেছে! এইসব অপসংস্কৃতির রমরমা বুঝিয়ে দেয় যে সমাজের গতি নিম্নগামী। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতা অন্যদিকে ভোট ব্যাংকের স্বার্থে ধর্মীয় নিয়মকানুনের জিগির টিকিয়ে রাখার দায় আর পাড়ায় পাড়ায় ভুই ফোড়ের মত নেতাদের উদ্ভব এই তিনের কম্বিনেশনে মূলত গ্রামের এক বৃহৎ অংশের তরুণ, কিশোর খুব খারাপভাবে বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী। যার ফল সমস্ত সমাজ জুড়েই প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানে যেখানে বারবার বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষের কথা বলা হয়েছে, সেখানে শিশু-কিশোর মনে এই অপবিজ্ঞানের চাষাবাদ কি সংবিধান বিরোধী নয়! এই অপবিজ্ঞানের চাষাবাদ বন্ধ করে সুস্থ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে।

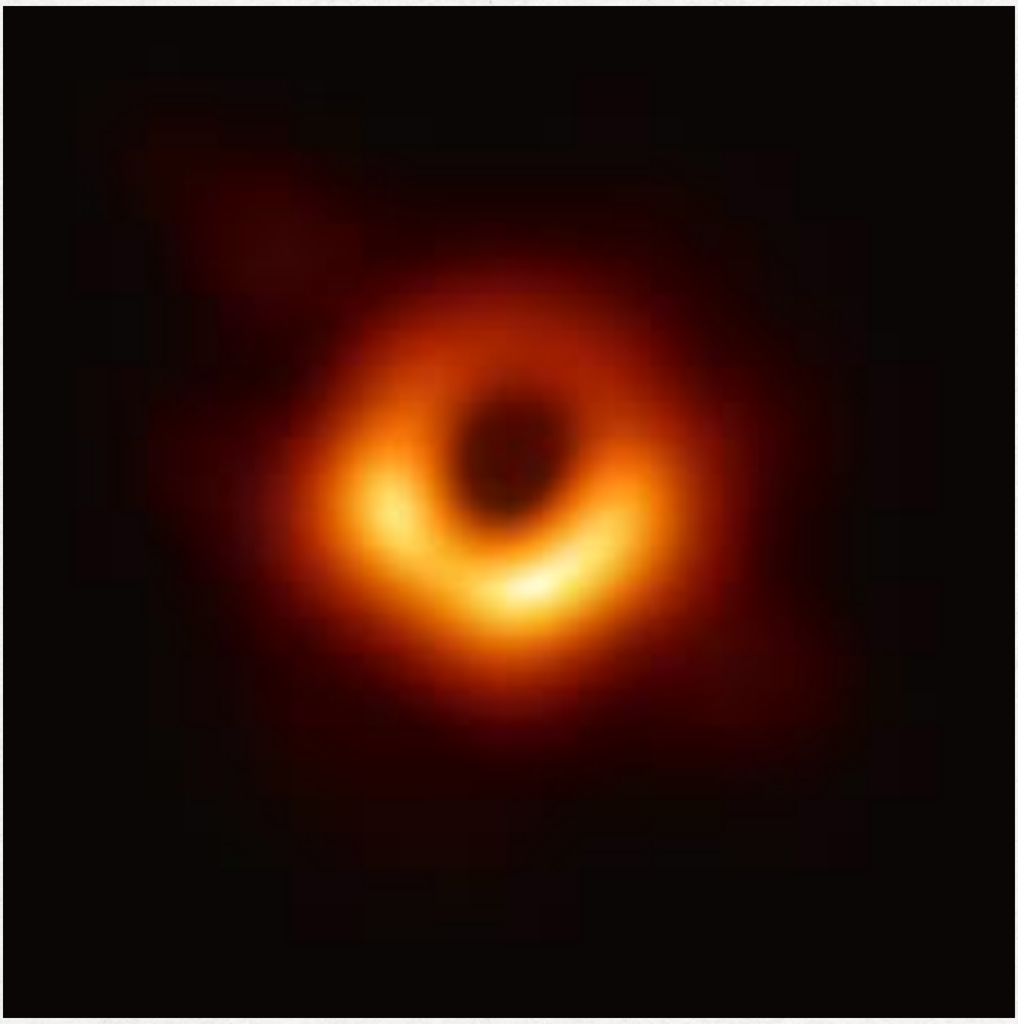
নক্ষত্রদের ঘূর্ণন

লি খে ছে ন – স রো জ না গ



যখনই আপনি গভীর মহাবিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দিকে তাকান, তখনই আপনি দেখতে পান অজস্র আলোর বিন্দু। আপনি জানেন সেগুলো হলো নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি। সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে বৃহদাকার নক্ষত্রগুলির আয়ুষ্কাল সবচেয়ে কম। কারণ তারা তাদের চেয়ে কম ভরের নক্ষত্রদের তুলনায় অনেক দ্রুত তাদের জ্বালানিকে পুড়িয়ে দেয়। একবার তারা জ্বালানির সীমায় পৌঁছে গেলে এবং উপাদানগুলিকে আর ফিউজ করতে না পারলে, তারা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং তারা হয়ে যায় নক্ষত্রের মৃতদেহ।

এই মৃতদেহগুলি একাধিক প্রকারের দেখা যায়। সর্বনিম্ন ভরের (যেমন, সূর্যের মতো) নক্ষত্রের জন্য শ্বেত বামন, পরবর্তী স্তরের জন্য নিউট্রন নক্ষত্র এবং সর্বাপেক্ষা বিশাল নক্ষত্রের জন্য ব্ল্যাক হোল। প্রতিটি মৃতদেহ নিজের অক্ষের চারপাশে তীব্র বেগে ঘুরতে থাকে। কিন্তু ব্ল্যাক হোলগুলি ঘোরে প্রায় আলোর গতিতে।



আকৃতি 2Black Hole, NASA

আমাদের সূর্য তার নিজের অক্ষের চারপাশে একবার আবর্তন করতে গড়ে প্রায় 27 দিন সময় নেয় (সূর্যের নিরক্ষরেখার কাছে প্রায় 25 দিন এবং মেরুবলয়ের কাছে এই সময়সীমা প্রায় 35 দিন)। অন্য দিকে একটি শ্বেত বামন নক্ষত্র একটি সম্পূর্ণ 360° ঘূর্ণন এক ঘন্টার কম সময়ে সম্পন্ন করে। এটি উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি কখনও ফিগার স্কেটিং দেখে থাকেন, তাহলে

আপনি নিশ্চয়ই এটা দেখেছেন যে একজন ঘূর্ণায়মান স্কেটার যখন তাঁর ছড়ানো হাত দুটি গুটিয়ে নেন তখন তাঁর ঘূর্ণন গতি বেড়ে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি হলো কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণের নিয়ম (law of conservation of angular momentum)।

কৌণিক ভরবেগ হল "একটি ভরের সাথে কতটা 'রোটেশনাল' এবং/অথবা 'অরবিটাল' গতি আছে?" আপনি যদি সেই বৃহদাকার বস্তুটিকে ফুলিয়ে দেন যাতে এর ভরের বিস্তার তার ঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে দূরে থাকে, তাহলে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণের জন্য এটিকে তার ঘূর্ণন গতিতে ধীরগতি করতে হবে। একইভাবে, যদি আপনি একটি বৃহদায়তন বস্তুকে সংকুচিত করেন, যাতে এর ভরের বেশির ভাগ তার অক্ষীয় ঘূর্ণনের কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে, তবে সেই বস্তুটিকে তার ঘূর্ণন গতি বাড়াতে হবে, প্রতি সেকেন্ডে আরও বেশি ঘূর্ণন ঘটাতে হবে। এইভাবে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত হয়।

যদি আপনি আমাদের সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রকে তার ভর, আয়তন এবং ঘূর্ণন গতি সহ বিচার করেন এবং এটিকে পৃথিবীর আকারের আয়তনে সংকুচিত করেন, যা একটি শ্বেত বামনের একটি সাধারণ আকার, তাহলে কী ঘটবে? বিশ্বাস করুন বা না করুন, আপনি যদি অনুমান করেন যে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত আছে এবং সূর্য ও

সূর্যের সংকুচিত সংস্করণ দুটিই আমরা গোলক হিসেবে ভেবে নিই তাহলে সত্যিই হিসাব করে বলা যায় কী ঘটবে। যদি আমরা ধরে নিই যে সূর্যের সম্পূর্ণটি প্রতি 35 দিনে একবার ঘূর্ণন সম্পন্ন করে এবং সূর্যের কেবলমাত্র ভিতরের কোরের 40% একটি শ্বেত বামন হয়ে যায়, তখন সেই সংকুচিত শ্বেত বামন হওয়া সূর্য মাত্র 25 মিনিটের মধ্যে একটি ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করবে।

সেই নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশের ভরকে ঘূর্ণনের অক্ষের (axis of rotation) কাছাকাছি নিয়ে এলে তার ঘূর্ণন গতি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। সাধারণভাবে দেখা যায় যদি আপনি একটি বস্তুর ঘূর্ণনের সাথে সাথে তার ব্যাসার্ধের পরিমাণ অর্ধেক করেন, তার ঘূর্ণন গতি চারটি ঘাত বা ফ্যাক্টর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণন গতি একটি ঘূর্ণমান ভরের ব্যাসার্ধের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক (inversely proportional)। বাস্তবে, শ্বেত বামনগুলি সাধারণত একটু বেশি ধীরে ঘোরে, কারণ নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলি উড়ে যায় এবং শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ "কোর" উপাদানগুলি একটি সাদা বামন গঠিত হওয়ার জন্য সংকুচিত হয়।

একটি নিউট্রন তারকা সাধারণত অনেক বেশি বড়ো নক্ষত্রের সুপারনোভাতে বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার পর পড়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ। এর কেন্দ্রের কণাগুলো অত্যাধিক চাপের ফলে এত সংকুচিত হয় যে এটি প্রায়

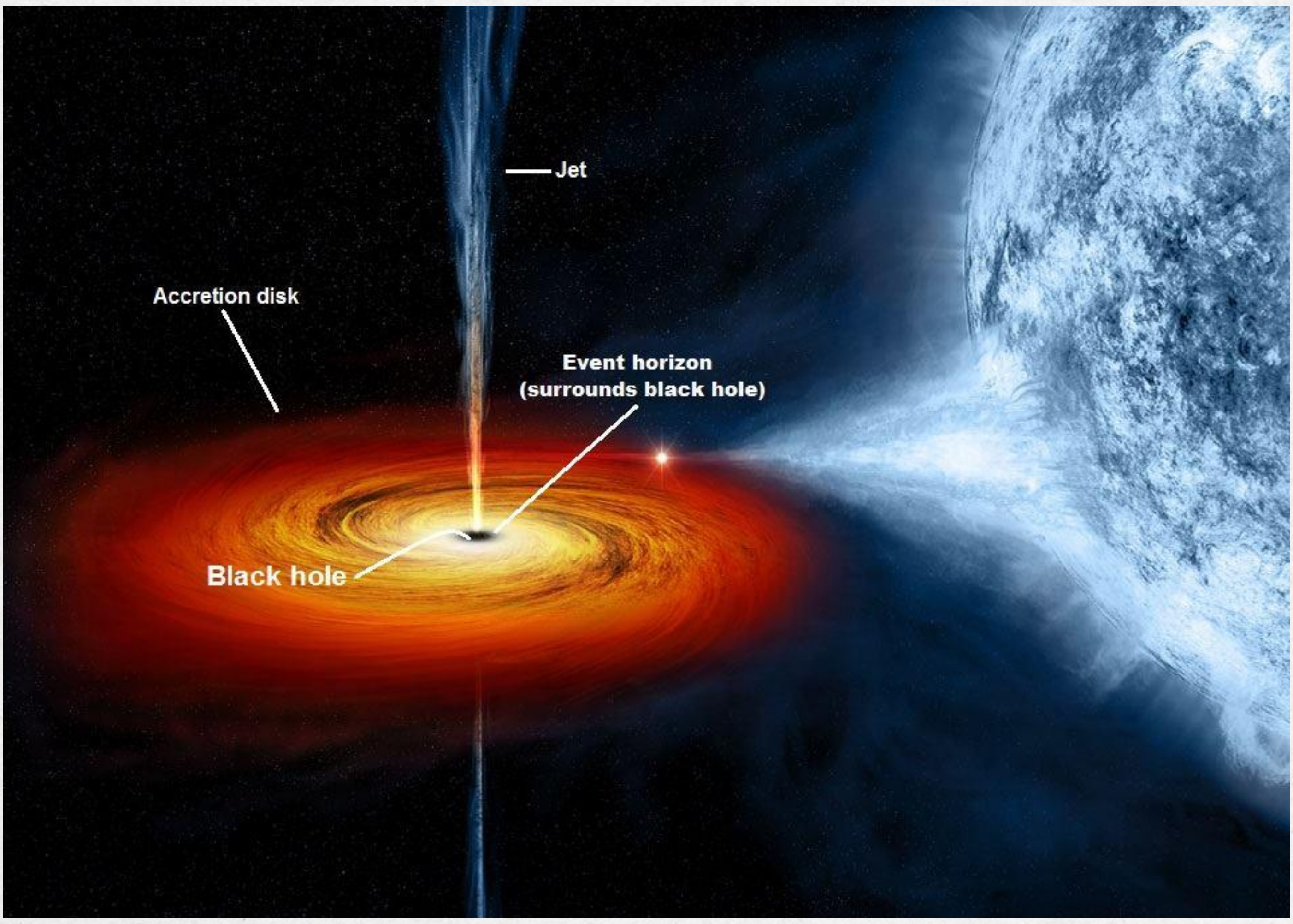
একচেটিয়াভাবে (90% বা তার বেশি) নিউট্রন দিয়ে গঠিত একটি দৈত্যাকার পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মতো আচরণ করে। নিউট্রন নক্ষত্রগুলি সাধারণত গড়ে আমাদের সূর্যের ভরের দেড় গুণ থেকে দ্বিগুণের মধ্যে। তবে সেই পরিমাণ ভর মাত্র 10 থেকে 40 কিমি ব্যাসার্ধ্য বিশিষ্ট গোলকের মধ্যে আবদ্ধ। নিউট্রন নক্ষত্রগুলি যেকোনো সাধারণ তারকা বা শ্বেত বামনের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ঘোরে।

আপনি যদি পুরো সূর্যকে একটি ছোট আয়তনে সংকুচিত করার পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু এইবার মাত্র 40 কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট সংকুচিত আয়তনে নিয়ে আসেন তাহলে আপনি শ্বেত বামনের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত হারে ঘূর্ণন পাবেন। সেই পরিমাপটি হলো প্রায় 10 মিলিসেকেন্ড! কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ফিগার স্কেটারের যে নীতিটি প্রয়োগ করেছিলাম, সেই একই নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তে আসা যায় যে নিউট্রন নক্ষত্র এক সেকেন্ডে 100 টিরও বেশি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের প্রকৃত পর্যবেক্ষণের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। কিছু নিউট্রন তারকা পৃথিবীর দৃষ্টিরেখা বরাবর রেডিও পালস নির্গত করে, সেগুলোকে পালসার বলা হয়। আমরা এই বস্তুর পালস পিরিয়ড পরিমাপ করতে পারি। দেখা যায় তাদের

মধ্যে কয়েকটি তারকা একটি ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক সেকেন্ড সময় নেয়, তাদের মধ্যে কিছু 1.3 মিলিসেকেন্ডের মতো কম, সর্বাধিক 716 ঘূর্ণন-প্রতি-সেকেন্ড (rotations-per-second) পর্যন্ত ঘোরে। সর্বাধিক হারে ঘূর্ণিত পালসারের নাম হলো PSR J1748-2446ad, এটি 2004 সালে আবিষ্কৃত হয়েছিলো।

সবচেয়ে দ্রুত ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারাগুলিকে মিলিসেকেন্ড পালসার বলা হয় এবং তারা সত্যিই অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত গতিতে ঘোরে। তাদের বাইরের পৃষ্ঠে এই ঘূর্ণন হারগুলি প্রকৃতপক্ষে রিলেটিভিস্টিক (relativistic)। যার অর্থ তারা আলোর গতির একটি উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশ নিয়ে গতিশীল। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেই গতি শূন্য মাধ্যমে আলোর গতির 50% এর বেশি গতিতে পৌঁছাতে পারে!



কিন্তু এটি মহাবিশ্বে পাওয়া সত্যিকারের অ্যাস্ট্রোফিজিকাল সীমার কাছেও যায় না। নিউট্রন তারা মহাবিশ্বের ঘনতম বস্তু নয়, সেই সম্মানটি ব্ল্যাক হোলের প্রাপ্য। সেটি নক্ষত্রের সমস্ত ভরকে মহাকাশের এমন একটি অঞ্চলে সংকুচিত করে (সিঙ্গুলারিটি!) যার ফলে আলোর গতিতে চলমান একটি বস্তুও সেখান থেকে পালাতে পারে না।

আপনি যদি সূর্যকে প্রায় মাত্র 3 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটি আয়তনে সংকুচিত করেন, তাহলে এটি একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। এই মাপকে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ (Schwarzschild radius) বলে যা নক্ষত্রের ভরের উপর নির্ভর করে। স্থান-কালের ফ্যাব্রিককে এই ব্ল্যাক হোল এতো বিকৃত করে যে ব্ল্যাক হোলের শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের বাইরেও অতিরিক্ত frame-dragging এর প্রভাব অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে যত বেশি আপনি সেই ভরকে সংকুচিত করবেন, স্থানের (এবং সময়েরও) ফ্যাব্রিকটি তত দ্রুত টেনে আনা হবে।

বাস্তবিকভাবে আমরা একটি ব্ল্যাক হোলের আশেপাশে স্থানের ফ্রেম-টেনে নেওয়ার পরিমাপ করতে পারি না। কিন্তু আমরা সেই স্থানের মধ্যে উপস্থিত থাকা বস্তুর উপর ফ্রেম-ড্র্যাগিং প্রভাব পরিমাপ করতে পারি। এর অর্থ হল পদার্থ সমৃদ্ধ পরিবেশে বিদ্যমান এই ব্ল্যাক হোলের

চারপাশে পাওয়া অ্যাক্রিশন ডিস্ক (accretion disk) এবং তার প্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করা।

তাই এগুলো এই ফ্রেম ড্র্যাগিং প্রভাবগুলি পরীক্ষা করার জন্য সেরা পরীক্ষাগার তৈরি করবে। সত্যিই এমন একটা পরীক্ষাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা হলো গ্যালাক্সি NGC-1365 -এর কেন্দ্রে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল (যা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা চিত্রিত প্রথম ছায়াপথগুলির মধ্যে একটি)। এটির বাইরের অঞ্চল থেকে নির্গত বিকিরণ সনাক্ত করা হয়েছে। তাকে পরিমাপ করে তার গতিও নির্ণয় করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন উপাদানগুলি শূন্য মাধ্যমে আলোর গতির প্রায় 84% গতিতে ঘোরে এবং তাঁরা মনে করেন অবশ্যই এর মধ্যে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণের প্রভাব বর্তমান।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) এবং Virgo-এর মতো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মহাবিশ্বে একত্রিত হওয়া ব্ল্যাক হোলগুলির ঘূর্ণনের অনুমান করেছেন। তাঁরা নির্ণয় করেছেন কিছু ব্ল্যাক হোল প্রায় 95% আলোর গতিতে ঘোরে। এটি তাত্ত্বিক ভাবে সর্বাধিক পরিমাপ। যে নক্ষত্রগুলি থেকে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয় সেগুলি অত্যন্ত ধীর গতিতে ঘোরে। অন্য দিকে বিজ্ঞানীরা

মনে করেন ব্ল্যাক হোলগুলিকে প্রায় আলোর গতিতে ঘুরতে হবে।

আপনি যদি মহাকাশে বস্তুকে সংকুচিত করে খুব ছোট করেন, তাহলে সেই বস্তুগুলোর অন্য কোনো বিকল্প নেই। যদি কৌণিক ভরবেগকে সংরক্ষণ করতে হয়, তবে তাদের ঘূর্ণন গতি বাড়াতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রায় আলোর গতিতে পৌঁছায়। সেই মুহুর্তে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হস্তক্ষেপ করবে এবং সেই শক্তির কিছু (এবং কৌণিক ভরবেগ) বিকিরিত হয়ে যাবে তার ফলে এটিকে তাত্ত্বিক সর্বোচ্চ মানের নীচে ফিরিয়ে আনবে। এই মহাবিশ্বে ব্ল্যাক হোলের অসাধারন গতিতে ঘোরার কোনো বিকল্প নেই। হয়তো কোনো দিন আমরা সরাসরি তাদের ঘূর্ণন পরিমাপ করতে সক্ষম হব।

চিত্র পরিচিতি (প্রথম ছবিটি) – The barred spiral galaxy NGC 1365. সৌজন্যে NASA/JPL Caltech/Judy Schmidt.

তথ্যসূত্র –

(১) Evidence from K2 for Rapid Rotation in the Descendant of an Intermediate-mass Star. J. J. Hermes et al 2017. The Astrophysical Journal Letters, Vol 841, No 1

(২) Hessels, J. W. T.; Ransom, S. M.; Stairs, I. H.; Freire, P. C.; Kaspi, V. M.; Camilo, F. (2006). "A Radio Pulsar Spinning at 716 Hz". Science. 311 (5769)

(৩) LIGO Caltech, MIT.

(৪) NASA ও Wikipedia.

‘চেতনার অন্বেষণে’ যুক্তিবাদী কমিউনিটিতে আসার আহ্বান -

চেতনার অন্বেষণে

Community · 13 groups

কেন কমিউনিটিতে যুক্ত হবেন -

- যুক্তিবাদী বন্ধুর বিপদে দ্রুত সবাইকে ইনফর্ম করা সম্ভব হয়।
- প্রয়োজনীয় আর্টিকেল, ম্যাগাজিন, বই পাওয়া যাবে।
- এখনও অবধি ১৩টি গ্রুপ মিলে ১২০০-জনের অধিক জড়ো হয়েছেন। সবাই একজায়গায় থাকলে মুক্তচিন্তকদের সংঘবদ্ধ থাকা যায়।
- একে অপরের পাশে থাকার সুবিধা তৈরি হয়।

কমিউনিটি গ্রুপ কী -

- এটি হোয়াটসঅ্যাপের একটি ফিচার যার সাহায্য একই কমিউনিটির মানুষেরা জড়ো হতে পারেন। তাই যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তক কমিউনিটির মানুষেরা জড়ো হচ্ছি।
- না, মোবাইল নাম্বার কমিউনিটিতে যুক্ত কেউ দেখতে পায় না। তাই প্রাইভেসি একই থাকে।

যুক্ত হওয়ার কোড

যোগাযোগ

Email: yuktibadira@gmail.com

যুক্ত হওয়ার লিংক -

https://chat.whatsapp.com/ICW39zNuLHO5GxdKym5ygC

বাঙালি মেয়ে পরাধীন মেয়ে

লি খে ছে ন – অ ঙ্গ দ



আমারই ভুল আমাদের বাঙালি মেয়েদের, মেয়েদের বাইরে ভাবা। তারা কখনোই তাদের মেয়েলী পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতেই চায় না – এটা আমার বোঝা দরকার ছিল। আমি তাদের মুক্তির কথা বলি, ওরা শশক ছানার

মতো ভয়ে মুখ লুকোয় গর্তের ভেতর। আসলে এরা বদ্ধতাটাকেই মুক্ত জীবনের আনন্দ;- এই মন ভোলানো বুলি আওড়ে আনন্দ পেতে চায়। এরা নিজেদের সুখ – দুঃখ অন্যের কাছে গচ্ছিত রেখে দিয়েছে। এদের সকল চিন্তা-ভাবনা অন্যের নাগপাশে আবদ্ধ। এরা হয় যেমন আছে যেমন থাকে ওটাকেই ভবিতব্য মনে করে কিংবা ওটাই ওদের পরিচয় বলে মনে প্রাণে মানে।

আমার বাঙালি মা'য়েরা আমার বাঙালি বোনের স্বাধীনতাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। আসলে ওরা পায়নি যা তা এদের দেওয়াটাকেই বোধহয় বিড়ম্বনা মনে করে, না হয় মেয়ে হয়ে অপর মেয়ের প্রতি ঈর্ষা এই আদিম সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগে। তাই তো তারা তাদের মা-র কাছে প্রাপ্ত সংস্কারটাকে কোনোরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করেই অন্ধভাবে তাদের মেয়েদের এবং সেই মেয়েরা তাদের কন্যাসন্তানদের মধ্যে চালিয়ে যেতে চায়। আসলে এরা এদের মনের মধ্যে গ্রথিত কোনো সংস্কারকে বিচার করাটাকেই পাপ মনে করে; মনে করে গুরুর ক্রোধ দৃষ্টির অধিকারী হবে।

গুরু, সেই গুরু যে আমাদের বাঙালি অন্ধ জড় সমাজের প্রতিমূর্তি; ইনিও জড়;- কিংবা জড়ের ভূমিকা পালনেই আনন্দিত হন; আসলে মনে হয় ইনি নিজেকে পথের মধ্যে হোঁচট খাওয়া অল্প গ্রথিত পাথরকে কথিত

গভীর পাতালভেদী ভগবান শিবের মতো ভেবে থাকেন এবং নিজের শতজীবাণুদ্বারা আক্রান্ত পদরজকে অমৃত জল বলে বাঙালি বঙ্গ নারীকে খাওয়াতেও কুণ্ঠাবোধ করেননা; বোধহয় মনে মনে আপ্লুত হন মহান কোনো পুণ্য কর্ম করলেন – এই ভেবে। ধিক! –

কিছুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা মেয়ে কেন মানুষ শব্দটিরই অপমান করা। আর একারণেই তারা আবদ্ধ অন্ধ নামক শব্দটি দিয়ে। এর দূরীকরণ তখনই সম্ভব যখন এরা প্রকৃত আলোকে সত্য মনে করে মনের অন্ধ কুটিরের মধ্যে সঞ্চার করতে চাইবে।

প্রকৃত আলো, জ্ঞান (যথার্থ জ্ঞান) শব্দটিরই সমার্থক মাত্র। আর এই আলো দান করার জন্যই মশাল হাতে আমি ওদের মনের আঁধারে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি; তারাও আমার অগ্রগতিকে তাদের মুক্তির পথপ্রদর্শক বলে শান্ত হয়ে বসেছে। এমন সময় আমার বঙ্গ মা'য়েরা হয়তো আমি তাদের মুখাগ্নি করতে চলেছি এইভেবে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও পূর্বের চেয়ে আরও জোরে তারা তাদের কন্যা শাবকদের সংস্কার নামক জংধরা মোটা শিকল দিয়ে বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে।

আমার বঙ্গ মায়েদের কাছে এটাই অবেদন একবার ওদের ওই যথার্থ জ্ঞানের অমৃত পান করতে দেওয়া হোক।

আমার বিশ্বাস ওরা যদি সত্যই তাদের কন্যার মঙ্গল কামনা করেন তাহলে তারা অবশ্যই পরে দেখতে পাবেন, তাদের জীবনে তারা যা পায়নি ইচ্ছা থাকা সত্বেও; তা এরা পেয়ে কতটা মঙ্গলকর জীবনযাপন করছে। খাঁচার বদ্ধ পাখি খাঁচার বাইরের জীবনে অসুরক্ষিত হতে পারে কিন্তু পাখির অন্তরের জীবন আমার বিশ্বাস খোলা আকাশ, ঘন গাছ পালার মধ্যেই প্রান বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত থাকে এবং ওটাই তাদের আসল মুক্তি।

তাই ‘ওরা যে মেয়ে’ এই মিথ্যাছলের কথাকে ওদের কাছে সত্য জ্ঞানের ভুল মন্ত্র শিখিয়ে চিরকালের মতো পূজার্চনার মধ্যে বেঁধে পুরুষদের পশ্চাদগমনকারী সীতা করে না রাখায় ভালো। বরং ‘ওরাও মানুষ’ এই সত্য জ্ঞানের মন্ত্র দান করা হোক ওদের, তবেই মানুষ ও জাতীর ও দেশের মঙ্গল সম্ভব।

ফুলকুসমা, বারিকুল, বাঁকুড়া

বাংলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক ঘটনা নিয়ে জেগে স্বপ্ন দেখা..

লি খে ছে ন – সৌ রা ষ্ট্র দা শ



বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়ে কারা পোস্ট করছেন। আর লিখছেন? এপারে RSS-ওপারে জামাত....! বলছিলাম এই কথা শুনলে বাংলাদেশের পিনাকী ভট্টাচার্য ও নয়ন চ্যাটার্জী'রাও

হাসবে তারা তো ‘জামাতপন্থী বুদ্ধিজীবী’। আসল কথা আপনারা যে জামাত এর কথা বলছেন সেটা আসলে ভারতেরই জামাত...।

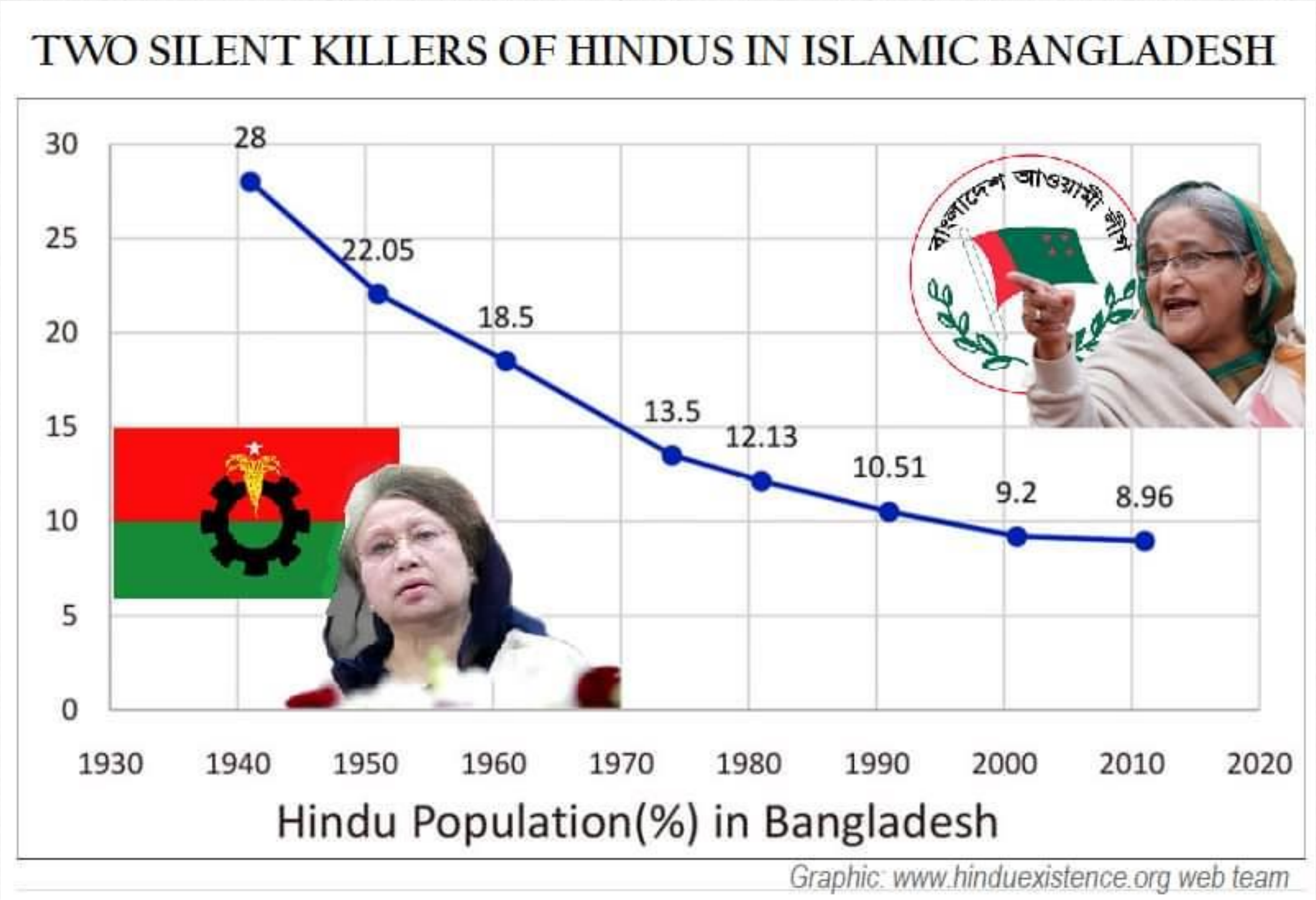
[1] সময় করে ফতোয়া আলগিড়ি পড়লে জানতে পারবেন। [2] আপনাদের গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমকে তারা কী বলে। তাদের ভাষায় আল-তাকিয়া বলে। এরপর আর কিছু বলার বাকি আছে? [3] যাইহোক এই বিষয় [আব্দুল্লাহ-আল-মাসুদ] ভালোই অবগত, তবে বাংলাদেশে জামাত শিবির আর নেই! এখন সবটাই রাজনীতি[4] এখন যেটা আছে সেটা হলো হেফাজত ইসলাম। [5]

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক হামলার পেছনে, হেফাজত বা আপনাদের জামাত এর কোনও হাত নেই। ওটা আপনাদের মানসিক অসুস্থতার একটি বাহির চিত্র মাত্র...! তাদের বিনা কারণ ছাড়াই দোষ দিচ্ছেন। এখন যদি বলেন এই কথার তথ্য কি? তার খুব সুন্দর উত্তর আছে। কিছুদিন আগে মুসলিম ছেলের প্রেমে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় এক হিন্দুমেয়ে নামে ফেক ফেসবুক ধর্মীয় কটূক্তির পোস্ট করে মিথ্যা অভিযোগে হিন্দু মেয়েটিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্ত এটা শেষ নয় এর তারপর শুরু হয় থানায় হামলা, আক্রমণ, CA land, uno, সার্কেল পুলিশ সুপারের গাড়ী ভাংচুর, তার সাথে থানাও ভাংচুর বুঝতেই পারছেন কতটা অনুভূতি।[6] ভিডিও দেখে মনে হল বাংলাদেশ পুলিশ কেমন তৎপর! এবং এইসব ঘটনা বছরে অনেক ঘটে তার

তথ্য [7] বাংলাদেশের চিড়িয়া তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আসলে বাংলাদেশ একটি এখন চিড়িয়াখানা। আওমলীগ ভয় দেখায়। তারা না থাকলে বিএনপি জামাত চলে আসলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা আবার ভারতের মত সংখ্যালঘু রাজনীতি করে না। যেমনটা ভারতে হয়। ওই তো আর কি জনসংখ্যা 90% তো মুসলিম এক কথায় মুসলিম রাষ্ট্র তবে ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। [8]

বাংলাদেশে এই মাস খানেক আগে একজন শিক্ষককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পুলিশের সামনে কি করা হল তা বলার মতো না। [9] বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন করতে চাইলে জামাত হেফাজত এদের কারোর দরকার হয় না। দরকার হয় একটি ফেক ফেসবুক আইডি [10] তারপর দেখুন কীভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা যায়। [11] এক কথায় ফেক ফেসবুক দিয়েই বিপ্লব চলে। [12] সেখানে কেন যে আপনারা জামাতকে টানেন বুঝতে পারি না। আপনারা এতই যখন জামাত বিরোধী তখন ভারতের জামাত শিবির বন্ধের জন্য মিটিং মিছিল করছেন না কেন? অথচ ভারতে RSS কুমির দিয়ে কী ধরতে চায় সেটা জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না। তবে কুমির কিন্তু ভয়ঙ্কর এটা মাথায় রাখবেন।

তবে পশ্চিমবঙ্গে 2016 সালে একজন যুক্তিবাদী ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করাতে একজন ভয়ঙ্কর বিষধর ধর্মান্ধ সাপ 295এ কেস করেছিল। [13] তবে ভারতে ফেক আইডি দিয়ে পোস্টের চেয়ে গো-মাংস অনেক বেশি বিপদজনক[14] আর বাংলাদেশে গরু না খাওয়ার জন্য কি হয় আর বললাম না। [15] তাই সব কিছুতে জামাত জামাত করে লাভ নেই। এমন করে জামাত এর নাম নেয়, মনে হয় জামাতের নাম না নিলে ভাত হজম হয় না। এই কথাটা বাংলাদেশের এক সিপিবি নেতা বলেছিলেন, তার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।



In 2001, following the electoral victory of BNP led by Khaleda Zia, her supporters unleashed a systematic campaign of violence against Hindus for about 150 days. The situation is now returned to a havoc for Hindus in Awami League regime under PM Sheikh Hasina.

আরেক মৌলবাদী আওমলীগ সরকার বলছেন এখনও অনেক লাশ পাওয়া যায়নি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যত হামলা হয়।[16] তার জন্য দোষ তো ধর্মের, তার থেকেও দোষ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হয়ে জন্ম

নেওয়া। আমি তো বলবো বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উচিত মুসলিম হয়ে যাওয়া।

তারা সংখ্যালঘুদের দেখলে তাদের কথা শুনলে মুমিনদের ধর্মীয় অনুভূতিতে যখন তখন আঘাত আসে। এমন কি বিবর্তনবাদ নিয়ে ছাত্রদের লেকচার দিলে মহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর ছুরি হামলা"[17] এতো শান্তির ধর্ম যে বিবর্তনবাদ এদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে। [18] তাহলে বলতে পারতাম জামাত ও RSS এক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ কিন্তু কিছুতেই এক করতে পারি না। এবং করাটা হবে চরম মূর্খতা, তার কারণ দুইজন ভিন্ন বিচার রাখে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা এতটাই ভালো আছে যে সবাই দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসছে। এবং এতটাই শান্তির ধর্ম গ্রহণ না করলে হিন্দুদের যত্ন সহকারে খৎনার সহী কাজ করছে মুমিনরা [19] তাই গল্প বাদ দিন, বাস্তবতা দেখুন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সাধারণ ঘটনা বর্তমানে.....! তার জন্য জামাত হেফাজত লাগে না। আসলে এই উপমহাদেশের মুসলিমরা আজও অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ তারপর হিন্দু আর শিখ এদের আচরণ বলে এদের অবস্থান কি? আর মজার বিষয় ভারতীয় ধর্মগুলি প্রশ্ন ও তর্ক করতে কিছুটা সমর্থন করে। সে খানে আব্রাহামিক ধর্মে সংশয়বাদেরও স্থান নেই।

চাইলে আরও তথ্য দিতে পারতাম। কিন্তু আপনারা কোনও তথ্য চেক করবেন না এটাই বাস্তবতা..

তথ্যসূত্র:
1 || লিংক 2 || লিংক 3 ||A - লিংক B - লিংক 4 || লিংক 5 || লিংক 6 || লিংক 7 || লিংক 8 || A - লিংক B - লিংক 9 || লিংক 10 || A - লিংক B - লিংক 11 || লিংক 12 || লিংক 13 || লিংক 14 || A - লিংক 15 || লিংক 16 || A - লিংক B - লিংক C - লিংক 17 || লিংক 18 || A- লিংক B - লিংক 19 || লিংক

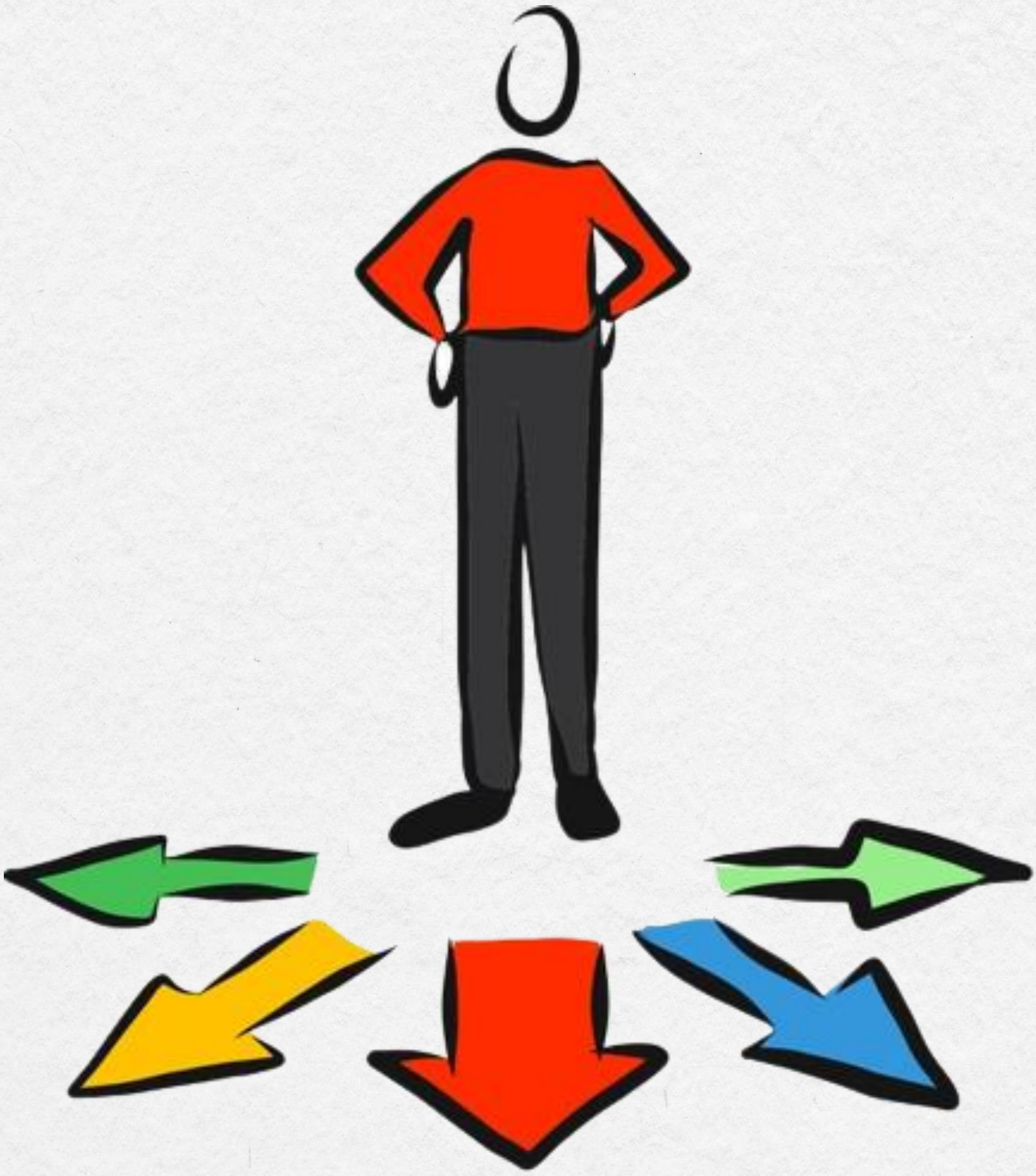
সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়, নেই কিরে কেউ সত্যসাধক বুক ফুলে আজ দাঁড়ায়?

– নজরুল

সূচিপত্র

কিছু বেয়াড়া প্রশ্ন

লিখেছেন – সৌরভ কুমার মান্না



১) ঈশ্বরকে কে বানালেন?

যদি বলেন তিনি স্বয়ম্ভু, সেই একই যুক্তিতে আমরা প্রকৃতিকে স্বয়ম্ভূ বলতে পারি।

২) যদি ঈশ্বরের তৈরী করার আগে কোনো স্থান না থেকে থাকে, তিনি আমাদের তৈরী করলেন কোন স্থানে বসে? সময়ও তো তিনিই তৈরী করেছেন, তাহলে কোন সময়ে তিনি আমাদের তৈরী করলেন?

৩) বিভিন্ন ধর্মমতে তিনি বিভিন্নরকম ভাবে বর্ণিত, কোনটা মেনে নেবো এবং কেন? পৃথিবীতে কিন্তু কমবেশি ৭২০০ ধর্ম আছে।

৪) আমাদের দেশ প্রায় ২০০ বছর ইংরেজদের অধীনে থাকতে বাধ্য হলো, অনেক খুন ও লুঠ হলো, জালিওনাওয়াবাগ হত্যাকাণ্ড হলো। কেন? তিনি তো আরও আগেই স্বাধীনতা এনে দিতে পারতেন।

৫) ঠাকুর, অবতারেরা ভারতে জন্মান আর পয়গম্বর এরা আরবভূমিতে কেন?

৬) ডায়ালিসিস, কেমো থেরাপি বিষয়ে ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই কেন?

৭) বিবর্তন সম্পর্কে ধর্ম কি বলে?

৮) জুনকো ফুরুতা, নির্ভয়া ঘটনা তিনি আটকালেন না কেন? এখানেও কি "তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন" থিওরি?

৯) একজন হিন্দু যদি বেশ কিছু বছর পর অন্য ধর্ম মতে দীক্ষিত হন তাহলে চিত্রগুপ্তর হিসাব কি থেমে যাবে নাকি হিসাব ট্রান্সফার এর ব্যবস্থা আছে?

১০) বি.এস.এফ এর হাতে বিপদতারিনী তাগা পরালে কি আর বর্ডারে কোনো দাঙ্গা হবে না?

সূচিপত্র

বিষয় - প্রতিবন্ধী

লি খে ছে ন – দি বা ক র ম ন্ড ল



ছোট থেকেই শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশু দেখলে খুব কষ্ট অনুভব করি। একটা সময় অন্যসব লোকের মত আমিও বিশ্বাস করতাম যে এগুলো সব ভগবানের দান। ধর্মগুরু, কীর্তনিয়া, এবং ইমামদের বক্তব্য থেকে যেটা বুঝেছিলাম যে, “মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী/বিকলাঙ্গ করে ঈশ্বর বা আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠান।”

এর পিছনে রয়েছে মূলত চারটি কারণ যথা-

(১) ভয়ংকর রকম পাপাচার বা আল্লাহর চরম অবাধ্যতার কারণে গজব (২) কর্মফল অর্থাৎ নিজস্ব কিছু

পাপের জন্য ভগবান প্রদত্ত ফলাফল এবং (৩) পূর্বজন্মের পাপের শাস্তি। (৪) মানুষের অভিশাপ।

দুঃখের বিষয় আজও এই ধরনের বক্তব্য সচরাচর মানুষের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, আজই আমি হসপিটালে থাকাকালীন এক মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে লক্ষ্য করে কিছু মানুষের এই ধরনের বক্তব্য শুনে মর্মাহত হয়েছি। যদিও বড় হওয়ার সাথে সাথে যতটুকু বুঝেছিলাম পড়াশোনা করে এবং আজ গুগল থেকে সাহায্য নিয়ে যেটুকু জানতে পেরেছি; মানুষ বিকলাঙ্গ হওয়ার পিছনে যে কারণ গুলি রয়েছে যথা

১) যদি কোন মহিলা ডায়বেটিস আক্রান্ত থাকেন তবে তার গর্ভের বাচ্চা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা খুবেই বেশি।

(২) স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি এই যৌনরোগের ভাইরাস এবং ব্যকটেরিয়া বহন করে তবে ইনফেকশন হয়ে গর্ভধারিণী মায়ের বাচ্চার বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারে।

(৪) কোন মহিলা যদি গর্ভাবস্থায় তামাক জাতীয় দ্রব্য যারা সেবন করেন তবে বাচ্চার শারীরিক ডিফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমেরিকার ১৫.৩ ভাগ মহিলা ধুমপান করেন যেখানে পুরুষরা করেন ২০.৫ ভাগ (২০১৩ সালের রিপোর্ট)। দেখা যায়, আমেরিকায় প্রতি ৩০ টি

শিশুর একটি কোন না কোন শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্মাচ্ছে। এর আর একটি অন্যতম কারণ, অ্যালকোহল। এখন গর্ভাবস্থায় যদি কোন মা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় লিমিটের বাইরে সেবন করে তবে তার প্রসবকৃত শিশুটা মুখের বিকৃতি তথা চেহারার বিকৃতি, কম ওজনের ছোট বাচ্চা প্রসব, আচারণগত সমস্যা বা মানসিক সমস্যা, এমনকি সময়ের পূর্বেই তথা ৩৮ সপ্তাহের আগেই বাচ্চা প্রসব হতে পারে| যার কারণে স্থায়ীভাবে নানান শারীরিক জটিলতা নিয়ে জন্মাতে পারে।

(৫) অনেক গোত্রের মেডিসিন আছে যেগুলো গর্ভাবস্থায় সেবন করলে বাচ্চা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যেমন, লিথিয়াম বা ইসোট্রিটিনিয়ন গ্রুপের ঔষধ। এগুলো সমসাময়িক কালের একটা বড় কারণ।

(৬) কোন গর্ভবর্তী মহিলা যদি গর্ভাবস্থায় বেনজোডায়াজেপাইন (Benzodiazepine) গোত্রের অসুধ সেবন করে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় আমার যেটা বুঝি "ঘুমের" ঔষধ সেবন করে তবে তার বাচ্চার জন্মের পর শাসকষ্ট বা হাপানী হতে রোগ নিয়েই জন্মাতে পারে। হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মাতে পারে। দূর্বল মাংসপেশী নিয়ে জন্মাতে পারে।

(৭) Norethisterone (নরইথিস্টেরন) হরমোনটি মহিলাদের মাসিক রজঃবৃত্তির চক্রের সাথে উঠানাম করে। এই হরমোন জাতীয় ঔষধটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ইররেগুলার বা পেইনফুল মেনস্ট্রল নিয়ন্ত্রণের জন্য। গর্ভবতী সময়ে এই ঔষধের সেবনে বাচ্চা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) আমরা জানি, গর্ভাবস্থায় যদি ভিটামিনের ঘাটতি থাকে তবে বাচ্চা নানান শারীরিক জটিলতা নিয়ে জন্মাতে পারে। বিশেষ করে, জিংক, ফলিকএসিড, আয়রণ, ভিটামিন এ, বি, ডি, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

অথাৎ শারীরিক এবং মানসিকভাবে যে সমস্ত শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, কেন হয়, তার বিজ্ঞানসন্মত কারন আমরা জানতে পারলাম, তাই কোনো বিকলাঙ্গ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে দেখে এটা আল্লাহর বা ভগবানের দান, পূর্বজন্মের পাপের ফল, এই ধরনের মন্তব্য করবেন না; এতে ঐ শিশুটি এবং তার পিতা-মাতা উভয়কে অপমানিত করা হয়। এই ধরনের বক্তব্য শোনার পর পিতা-মাতার মধ্যে যে অন্যায় বোধ কাজ করে সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি এক প্রতিবন্ধী শিশুর মায়ের সাথে কথা বলে বুঝেছি তিনি কতটা হীনমন্যতায় ভুগছেন, কতটা কষ্টে রয়েছেন!

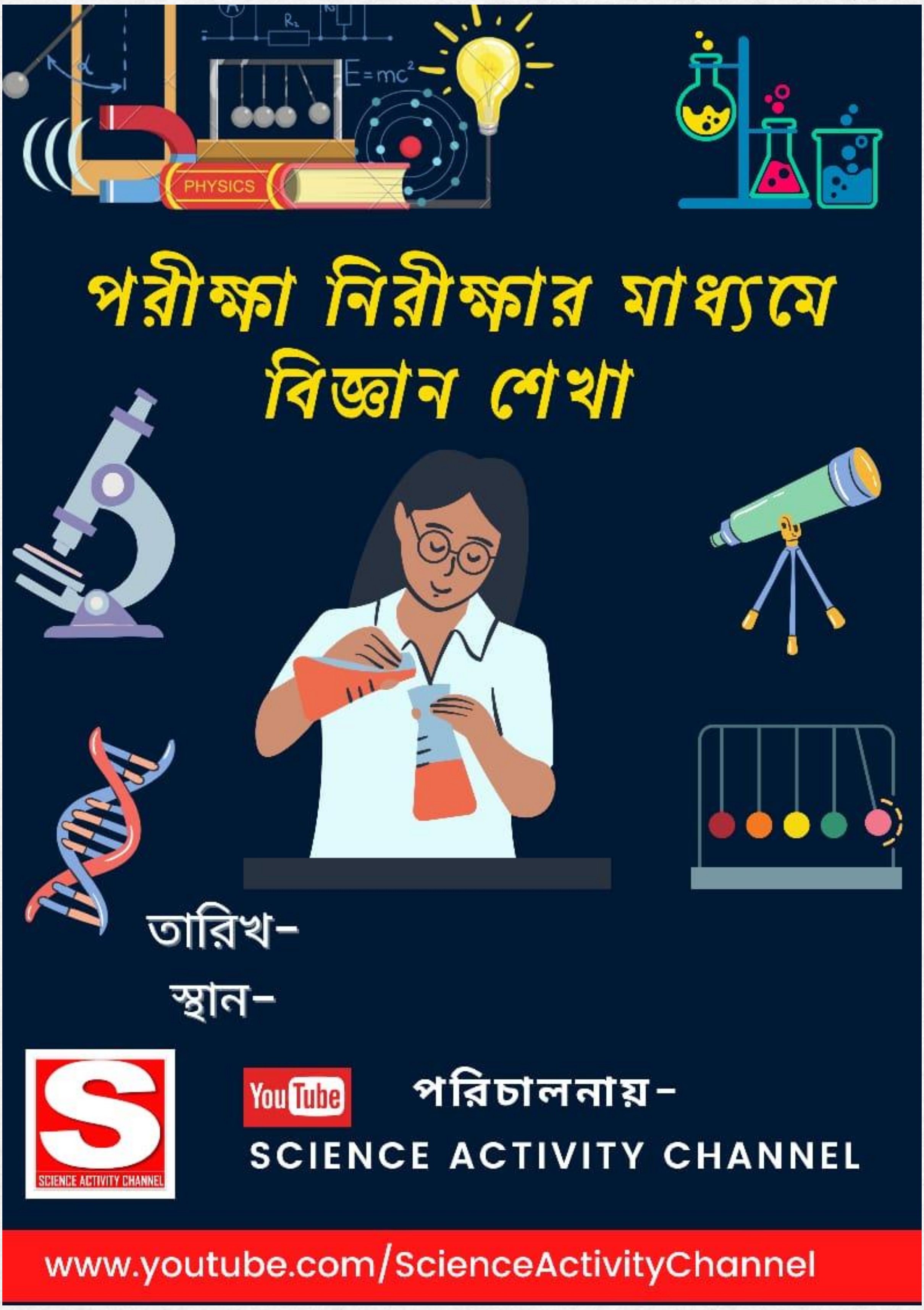
তাই সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা বিজ্ঞানমনস্ক হন, ধর্মীয় কাল্পনিক, অবৈজ্ঞানিক গল্প কথায় বিশ্বাস করে কাউকে নিজের অজান্তেই অপমান করবেন না।

প্রামাণিক পাড়া, ফলতা,
দ. ২৪ পরগনা, প: ব:

"আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত নাও হতে পারি,

কিন্তু আমি আমৃত্যু তোমার কথা বলার অধিকারের জন্য লড়ে যাব।"

- ভলতেয়ার।



কোনওরকম খরচাপাতি ছাড়াই বিভিন্ন বিদ্যালয় যোগাযোগ করতে পারে।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে -



গোপাল মন্ডল

বিজ্ঞান শিক্ষক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মী

যোগাযোগ- 9635-578-948; website

আস্তিক ভাই, কটা প্রশ্নের জবাব দেবেন প্লিজ?

লি খে ছে ন – বি শ্ব না থ মু র মু



আস্তিক হলেন সেই মানুষ, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। শুধু ঈশ্বর নয়, তিনি যাবতীয় দেব-দেবী, অপদেব, অপদেবীতেও বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত বা দেব-দেবীর আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না, ঝরে না, মানুষের জগতের ভালো বা মন্দও হয় না, কোনও কিছুই ঘটে না। জাগতিক যাবতীয় ঘটনাবলী, তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছেতেই ঘটছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঈশ্বরের নিত্য লীলা ইত্যাদি। তেমনই ছোটখাটো অন্য অনেক ঘটনাবলীও ঈশ্বরের ইচ্ছা

অথবা তার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অবতার যথা, শিব, ব্রহ্মা, নারায়ণ, বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষী, কালী, রাম, হরি, গরাম ঠাকুর, মারাংবুরু আদিদের ইচ্ছা ব্যতীত সাধিত হয় না। অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে।

নাস্তিক হলেন সেই মানুষ, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কোন দেব-দেবী, অপদেব, অপদেবীতে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে বা বিজ্ঞানের নিয়মে যা ঘটা উচিত, সেইভাবেই যা কিছু জাগতিক ঘটনা ঘটে, ঘটে চলেছে। কোনও ঐশ্বরিক পূর্ব পরিকল্পনা বলে কিছু হয় না, হতে পারে না। ঠিক একইভাবে এটাও বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরের কোনও ক্ষুদ্র কনা বা অবতার বলে কিছু হয়, যাকে দেব দেবী বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং তার পূজার্চনা বা জপতপ করলে কোনও অভিলাষ পূর্ণ হবে।

এই বারে, খুবই বিনীতভাবে এই প্রশ্নগুলি পেশ করছি। আর আশা করছি যে সৎসাহসের সঙ্গে আন্তরিকভাবেই কোনও আস্তিকবাদী ভাই এর যথাযথ উত্তরগুলি দেবেন।

- আমি যে নাস্তিক হব অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করব না, এটা তাঁরই ইচ্ছা নয় কি? (যদি থাকেন)। কেন না, তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছা ব্যতীত কোনও কিছুই তো হওয়ার নয়।

- জাগতিক কোনও ঘটনাকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা কীর্তিকলাপ বলে মনে করব না, মেনে নেব না, এও নিশ্চয় তাঁরই পূর্বনির্দেশ? (যদি থাকেন)।

- আপনি আস্তিক মানুষ হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করবেন, দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করবেন, তেমনই আমি নাস্তিক হয়ে তাঁর অস্তিত্বকে, মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করবো, এও তাঁর অসীম করুণা নয় কি? (যদি থাকেন)।

- আমাকে ব্যাখ্যা দিন, আপনার ঈশ্বর আমার মনে তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই এই অবিশ্বাস জাগিয়েছেন কেন?

- জাগতিক ঘটনাবলীর জন্য নিতান্ত যে প্রকৃতিই দায়ী এটাই বা আমার মনে আনলেন কেন?

যুক্তিবাদী ব্যক্তি, দল অথবা মঞ্চ বলে যা গড়ে উঠেছে, আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, এর জন্যও আপনার ওই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই দায়ী (যদি থাকেন)। কিন্তু কেন?

- মানুষকে ঈশ্বরের নামে বোকা বানাবেন এটা যদি তাঁরই ইচ্ছা হয়, তাহলে তার প্রতিবাদ করাও তাঁরই ইচ্ছা, কি বলেন? ঈশ্বর কেন এমন ইচ্ছা করলেন?

মোরবি সেতু মৃত্যুকান্ডের (বলা উচিত হত্যাকান্ড) সেতু রক্ষণাবেক্ষনের কর্তারা বলেছেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে কেন তদন্তকারী দল তাঁদেরকেই দায়ী করেছে? আপনি স্বীকার করতে বাধ্য যে মোরবি

দুর্ঘটনার অপরাধীদের কারাবাস নিশ্চিত, তাহলে এও নিশ্চয় তাঁরই ইচ্ছা!

আসলে আস্তিকেরা ইচ্ছে করেই মনগড়া এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা প্রচার এজন্যই করেন যে স্বল্পশ্রমে লেহ্যপেয় সহযোগে কেমন আয়েশী জিন্দেগি যাপন করা যায়।

আস্তিক ভাই, মানতেই হবে আপনার অথবা আপনাদের এলেম আছে বটে। শস্য উৎপাদন বা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে বা দেশের যে কোনও উৎপাদনে গতর না খাটিয়েও দিব্যি পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে করে খাবার সুন্দর সহজ পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন। ধন্য আপনি, ধন্য আপনারা।

রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত এমনভাবে বজ্রআঁটুনি দিয়ে রেখেছেন যে বড় বড় নেতা/অভিনেতা, মন্ত্রী, আমলা, শিল্পপতি থেকে কৃষক শ্রমিক সব আপনাদের মুষ্টিতে। সত্যিই, ঈশ্বরের অথবা দেবদেবীদের কৃপা ছাড়া এটা সম্ভব হত না (আপনার মতে আমার মতে নয়)।

সাধারন মানুষ যাতে প্রশ্ন না করে, প্রশ্ন করলেও যাতে এমন উত্তর পায় যা আপনাদের উদ্দেশ্যকেই পূর্ন করবে, তাই আপনারা ধর্মের নামে (তথাকথিত) ভালো ভালো অজস্র কেতাব রচনা করেছেন, আখড়া বানিয়েছেন, আশ্রম খুলেছেন, আশ্রমের শাখা-প্রশাখা খুলেছেন।

আমি বা আমরা বিনা প্রশ্নে কোনওকিছু মানতে রাজি নই। কে, কী, কেন, কেমন করে, কবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন করার অধিকার মানুষের জন্মগত। আপনারা গোড়াতেই তাকে উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর, যুক্তি দেন ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’। আপনারা তাই চান না যে মানুষ শিক্ষিত হোক। এই বিষয়ে আপনাদের ব্যাপক গবেষণায়, গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োগে সত্যিই অবাক মানতে হয়। আপনারা দেখেছেন, মানুষ স্বচ্ছল হলে, স্বাবলম্বী হলে তারা শিক্ষালাভের চেষ্টা করে। তাই আপনারা আপনাদের আবিষ্কৃত ‘অন্নচিন্তা চমৎকারা’ ফর্মুলা প্রয়োগ করেন। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, মানুষ আর কোনওদিকে চোখ মেলে তাকাবার সুযোগই পায় না। আপনাদের বাবার আখড়া, মায়ের আখড়ার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে মানুষকে এটা বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাদের নিজেদের পূর্বজন্মের অথবা পূর্ববর্তী প্রজন্মের পাপের ফলেই তারা গরীব এবং অশিক্ষিত। তাদেরকে এটা বোঝাতেও সক্ষম হন যে তারা একমাত্র ভগবৎ স্মরণেই মুক্তিলাভ করতে পারে।

সাধারন মানুষের যুক্তিবোধের প্রশ্নের উত্তরে, আপনারা সবই তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেন। কেউ বেশি প্রশ্ন করলে, কোনও কিছু মেনে নিতে না চাইলে, আপনারা সংযম না রেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং অকথা কু’কথা বলেন, অভিশাপ দিয়ে দেন।

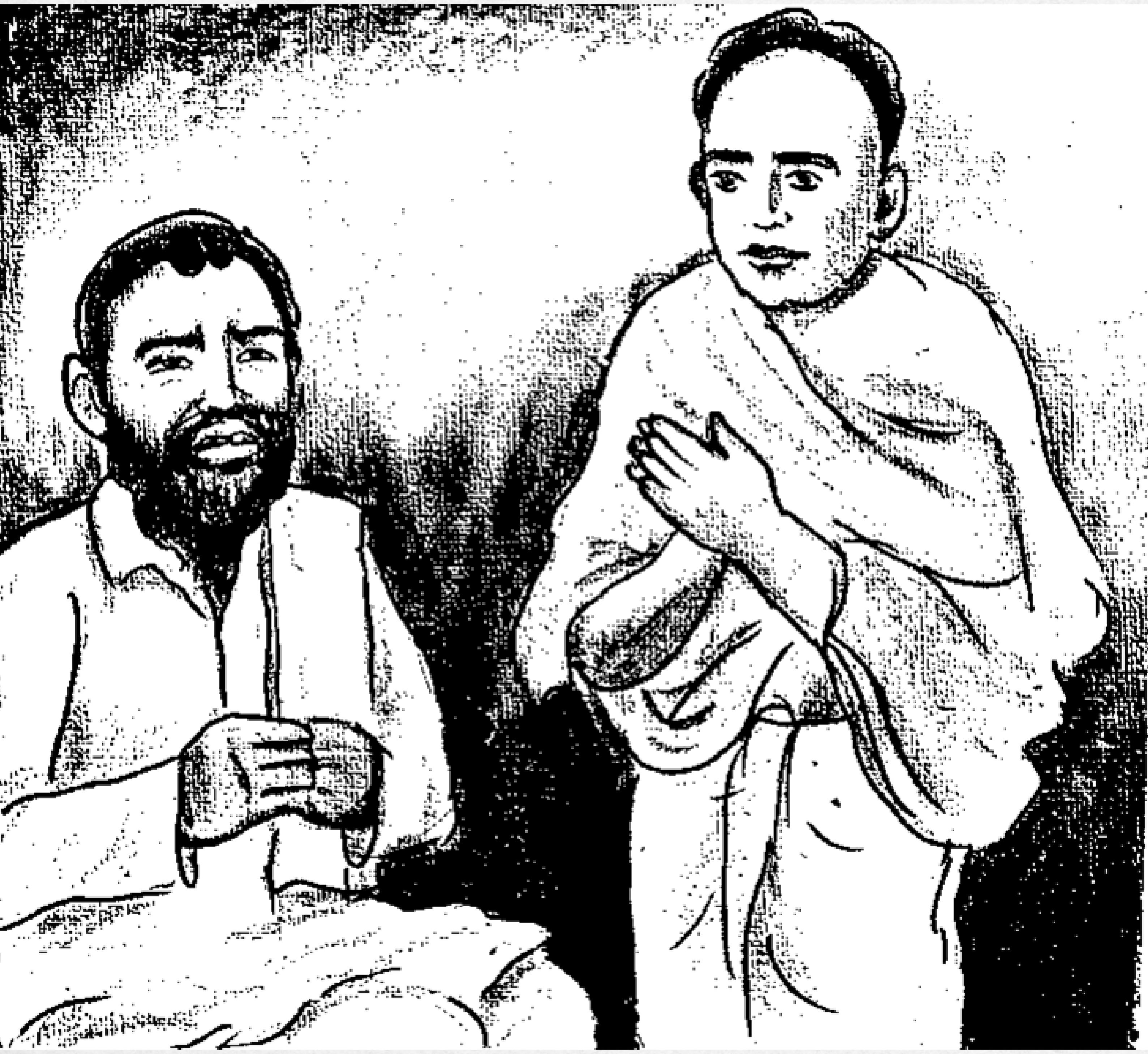
- এ সবই কি তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছা বলেই চালিয়ে দিতে চান?

তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছে ব্যতীত যখন কিছু হওয়ার নয়, তখন আমি যে মাধ্যমিকে ফেল করব এও নিশ্চয় তাঁর বা তাঁদেরই ইচ্ছে! তাহলে, সেই কারণে আমার বাবা আমাকে বকবেন বা চাবকাবেন কেন? এটা কি তাঁর বা তাঁদের স্ববিরোধিতা হয়ে যাচ্ছে না? এ'তো জোড়াতালি দেওয়া যুক্তি। ঠিক যেন গাছেরও খাব আবার তলারও কুড়োব। বাহ্ আস্তিক ভাই, ধন্য আপনাদের যুক্তি।

সেরকম কোনও কিছু থাকলে, তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছেতেই তো কোনও বিরুদ্ধবাদীদের থাকবার কথাই নয়। ফলে, কোনও সন্দেহ, কোনও প্রশ্ন ওঠবার কথাই ওঠে না। অথচ প্রশ্ন উঠেছে, উঠছে। তারপরেও কি আপনারা গোঁ ধরেই থাকবেন? তাছাড়া আপনাদের আর উপায়ই বা কি আছে? আপনাদের তাসের ঘর ভেঙে যাক, এটাতো আর চাইতে পারেন না! তাই, যেভাবেই হোক, একে রুখতে হবেই। হ্যাঁ মানছি, আপনাদের বনিয়াদ খুব শক্ত ভিতের উপরই দাঁড় করিয়েছেন। তবে, এটাও জেনে রাখুন, আজ হোক কি কাল হোক, দু'বছর কি দশবছর কি দু'শ বছর পর আপনাদের ভিত আমরা যুক্তিবাদীরা ভাঙবই ভাঙব। জেনে রাখুন, মানুষ জাগছে, জাগবেই আজ কি কাল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - রামকৃষ্ণ, একটি 'অসফল' সাক্ষাৎকার

লিখেছেন – অভিষেক দে



পর্ব – ১

কামারপুকুর থেকে আগত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ গদাধর চট্টোপাধ্যায় তখন কলকাতায় এক পরিচিত নাম। তিনি প্রায়শই 'বড় মানুষদের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হন। তাদের বাজিয়ে দেখতে চান। নিজের

কষ্ঠিপাথরে, অন্য কথায় ধার্মিকতার কষ্ঠিপাথরে তাদের বিচার করতে চান। কথামৃতকার শ্রীম তার ভক্ত। তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর অবশ্য পূজারী বামুনটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তাঁর কর্মপরিধি ধর্মকুসঙ্গ থেকে বহুদূরের। কেবল জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীম কে "কীরকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন?" যাই হোক শ্রীম, যিনি তখন বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে কর্মরত এক শিক্ষক, নিয়ে গেলেন তার প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাসগৃহে। বিদ্যাসাগর-গদাধরের সাক্ষাৎ হল 5 অগস্ট, 1882 ।

বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ভদ্র ও সুন্দর ব্যবহার করলেন গদাধরের সঙ্গে। তাঁকে বর্ধমানের মিষ্টি খেতে দিলেন। গদাধর তার স্বভাব অনুযায়ী ধর্মকথায় খই ফোটালেন। একথা সেকথা। সবই একই বিষয়ে ঘোরাঘুরি। কথামৃত পড়লে জানা যায় গদাধরের প্রবচনপ্রিয়তা। বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও কিছু ভাল ভাল কথা বললেন, "তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, বিদ্যার সাগর" ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের দয়া করুণার প্রশংসা করলেও ঠারেঠোরে বোঝাতে চাইলেন এসব ঠিক আছে তবে আসলে ঈশ্বরের কথা না ভাবলে সব মাটি। অর্থাৎ কিনা একমাত্র গদাধরের পথটিই অবলম্বনীয়। তিনি যা করছেন তার কাছে এসব দান দয়া সব ফিকে। এসব সারবত্তাহীন ভাবের কথার

থেকে মানুষের অভাব যাকে বেশি বিচলিত করতো সেই কর্মবীর মানুষটি 16 বছরের ছোট এক অশিক্ষিত পুরোহিতের কথা কিভাবে নিয়েছিলেন অনুমান করা কঠিন নয় তবে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। বরং "সাগরে এসে মিললাম" এর উত্তরে মজার ছলে, "তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান" বলেছেন| কথামৃতে এই সাক্ষাৎকারে কথোপকথনের সিংহভাগ জুড়ে আছে গদাধরের মুখঃনিঃসৃত কথাবার্তা, অন্য কথায় সেই চেনা ধর্মীয় বুলি,যা আছে কথামৃতের সর্বত্র। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেছেন - "তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?" পাঠক এই প্রশ্নটি মনে রাখুন। এই প্রশ্নের উত্তর থেকে পরে গদাধরের মনোজগতের একটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

উত্তরে গদাধর জানান নিশ্চয়ই তাই। তাতে বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন, বিদ্যাসাগর প্রায় সমস্ত সময়টাই গদাধরকে নিচ্ছেন হালকা মনে। সহাস্যআননে। গম্ভীর তত্বকথা যা ভাবাতে পারে, তাতে মানুষের আচরণ এরকম হয় না। গদাধরের বচনামৃত যে তাঁর মনে রেখাপাত করছে না, (বা পরেও করেনি) তার প্রমাণ পাতায় পাতায়।

গদাধর বলছেন "তাকে পান্ডিত্য দিয়ে বিচার করে জানা যায় না|" (বিদ্যাসাগর পন্ডিত ব্যক্তি বলেই কি তার সামনে এই জাতীয় কথাপ্রসঙ্গ ?) এর মধ্যে মাঝেমধ্যে

তিনি ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। কখনো মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষায় 'সমাধিমন্দিরে' চলে যাচ্ছেন।

এসব পর্বের পর গদাধর বিদ্যাসাগর কে বললেন "একদিন বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান"। তাতে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তা যে কেবল কথার কথা ভদ্রতা ছিল, আমার জানতে পারি তিনি কখনোই রাসমণির বাগান দেখতে না যাওয়ায়। পাঠক এই প্রসঙ্গটিও মনে রাখুন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধর্মপ্রসঙ্গ করবার পর (অবশ্য কথামৃতে বহু কথার সংযোজন শ্রীমর, এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে) গদাধর বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন এখানে ঠিক হালে পানি পাওয়া যাবে না।

এটি বিদ্যাসাগর - গদাধরের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার।

যৌক্তিক দৃষ্টিতে ভাবাটা বোধহয় অসঙ্গত নয় যে তৎকালীন সমাজে গদাধর চট্টোপাধ্যায় নানান লোকের তোল্লাই পেয়েছিলেন। নিজেকেই স্বয়ং অবতার বা ভগবান ভেবেছিলেন কিনা জানি না তবে ভগবান সম্পর্কে তিনি যে একজন authority এই বোধ বেশ দৃঢ় ভাবেই তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষাৎকারটি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। তিনি অন্যদের

চেয়ে বেশ কিছুটা আলাদা (যদিও নিজেকে বহুক্ষেত্রে অধম বলে বিনয় করেছেন) সেই ধারণাও তার অবশ্যই হয়েছিল।



পর্ব – ২

নিজের আগ্রহেই যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায় কলকাতার তৎকালীন নামী মানুষদের সঙ্গে যেচে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন, নিজের ধর্মে তাদের ভজানোর জন্যই হোক বা 'বড় মানুষ' দেখার ঐকান্তিক আগ্রহেই হোক, তখন তিনি নানান মানুষের মত পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গেও দেখা করে তাকে নানান ধর্ম প্রবচন দেবার পরে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দেখতে আমন্ত্রণ করেন। বলাই বাহুল্য বিদ্যাসাগর তখন মিষ্টি কথায় তাঁকে, 'আপনি এলেন আর আমি যাব না!' বললেও কখনোই কালীবাড়ির পথ মাড়াননি। কারণ বিদ্যাসাগরের চলার পথ ছিল যুক্তির ও কর্মের। ভাববাদের ও কুসংস্কারের পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে তাঁর শিক্ষিত শীলিত যৌক্তিক চেতনা ছিল অনেক দূরের।

এই পর্বে আমরা শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষাৎকারটির ভিত্তিতে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মনোজগতে সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করব।

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখি পদমর্যাদায় ও সম্মানে বড় কোন মানুষকে একজন সাধারণ মানুষ, যিনি শিক্ষার আলো তেমন পাননি অথবা পদমর্যাদায় অনেক নীচের, তিনি কিভাবে দেখেন? হয় তিনি উচ্চপদের মানুষটিকে অতিভক্তি দেখাবেন নয়তো তাঁর সামান্য ভুল ত্রুটি খুঁজে নিয়ে তাকে, 'আরে ও তো অতি সাধারণ, এই সামান্য কথাও জানে না!' জাতীয় কথা বলে নিজেকে তাঁর চেয়ে বড় দেখানোর চেষ্টা করে নিজের অহংপুষ্টি করবেন। এটি গ্রাম অঞ্চলে অতি সাধারণ একটি ঘটনা। আমার ঠিক এই মনোবৃত্তিই দেখতে পাব গদাধরের একটি মন্তব্যে। গদাধর, যে কিনা তৎকালীন সমাজে কিছু পৃষ্ঠপোষকের তোল্লাই পেয়ে বেশ একটু পরিচিতি পেয়েছে, তার ইগো বুস্টেড হয়েছে বেশ ভালই! বিদ্যাসাগর কথার কথা 'আপনি এলেন আর আমি যাব না' বলে, না যাওয়ায়, পরিস্কার বলে বসে, 'বিদ্যাসাগর মিথ্যা কথা কয় কেন?'। পাঠক ভেবে দেখুন বিদ্যাসাগর যে কিনা একা হাতে শিক্ষার মশাল নিয়ে তখন সমাজ সংস্কারে, শিক্ষাবিস্তারে, পরের দুঃখনিবারণে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, তখন তাঁকে সরাসরি "মিথ্যাবাদী" প্রতিপন্ন করে দিতেও এই পূজারী বামুনটির বাধছে না! যেন দক্ষিণেশ্বরে এসে বেশ একটু ধর্মকথা শুনে, সমাজে রামকৃষ্ণ কে আরেকটু পরিচিত করে দিলেই

সে সত্যবাদী নাহলেই মিথ্যুক। এখানে হয়তো তার বুঝতে ভুল হয়েছে যে ওটা কেবল কথার কথা নয়ত ধরে নিতে হয় বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধি কোন মন্দিরের চৌকাঠ দিয়ে যায় না এই সামান্য বিষয় বোঝার মত বুদ্ধিও তার ছিল না। যাই হোক, গদাধরের মন্তব্যটি কথামৃতে রয়েছে।

আগের পর্বে আমরা দেখেছি বিদ্যাসাগর গদাধরকে প্রশ্ন করেছিলেন (কথামৃত অনুযায়ী) -"তিনি কি কাউকে বেশি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?" তাতে গদাধর জানান, নিশ্চয়ই, নাহলে তোমাকেই বা এত লোকে মানে কেন, 'তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?'

পরে কথামৃতে দেখি এই প্রশ্নে গদাধরের ছদ্ম অহং কিভাবে পুষ্ট হয়েছিল তারই একটি মন্তব্য থেকে। গদাধর বেশ নিজেই নিজেকে সাবাশ দেবার কায়দায় বলে বসে, "বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি!” এই জাতীয় গভীর আত্মবিশ্বাস ও তার আত্মম্ভরী ঘোষনা একমাত্র মূর্খের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে কিনা এক কথায় কাউকে চিনে যাবার দাবি করতে পারে! এখানেও সেই পূর্ব কথিত মনস্তত্ব কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। আসলে তার মত এক 'অবতার' ধরাধামে নেমে লীলা করছে, 'যেই রাম সেই কৃষ্ণ সেই এই দেহে রামকৃষ্ণ', তাকে কিনা এতখানি উপেক্ষা! নিজে যেচে গিয়ে ডাকলেও না আসা! নিশ্চয় গদাধরের অহং তীব্র আহত হয়েছিল। তাই কি এতখানি বিষোদগার বিদ্যাসাগরের বিরূদ্ধে? অনুমান করা কঠিন নয়।

আচ্ছা তথাকথিত 'যত মত তত পথ' এর প্রবর্তক হঠাৎ করেই বিদ্যাসাগরের পথটিকে গ্রহনযোগ্য মনে করেননি কেন? তার মধ্যে তাহলে আসলে সংকীর্ণতাই ছিল,এমন মনে হয়নি কি?

পাঠকদের প্রসঙ্গক্রমে তিনটি ঘটনা জানিয়ে বলি -

ঘটনা ১ : শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। একবার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় বিদ্যাসাগর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে বেশি যাতায়াতের জন্যই শ্রীম বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। শ্রীম গুরুর অপমান হচ্ছে বুঝে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। ধন্য শিক্ষক বলতে হয়! যার কাছে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল গুরুর সম্মান!

ঘটনা ২ : ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বদলে ধর্মশিক্ষা বেশি দিচ্ছেন খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর (তাঁর ছাত্রতুল্য) তাঁর বিদ্যালয়ে কর্মরত নরেন্দ্রনাথ দত্তকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট মতামত ছিল শিক্ষকরা অবশ্যই ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবেন।

ঘটনা ৩: গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, তাঁকে নিয়ে কোন অনুষ্ঠান করবেন হলে তার শিষ্যরা বিদ্যাসাগরের কাছে চাঁদা চাইতে যান। সেই বিদ্যাসাগর যিনি অন্যের কষ্টে অনেকসময় অপাত্রেও দান করেছেন, তিনি তাদের একটা টাকাও দেননি।

নিশ্চয় দেশের যুবসমাজ যাঁদের তিনি চেয়েছিলে আধুনিক শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলতে, তাদের এভাবে পথভ্রান্ত হতে দেখে একজন মানুষ গড়ার কারিগর বিদ্যাসাগর খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন।

এই ঘটনা ও উপরের আলোচনা থেকে বোধহয় যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে এই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে বিদ্যাসাগরের,তথাকথিত পরমহংস এবং তাদের চেলাদের সম্পর্কে মনোভাব কেমন ছিল। তিনি এই ধর্মের নামে সমাজকে অন্ধকারের দিকে যেতে দেখছিলেন যা তাঁর নিজের সমাজ ও মানবগঠনের পরিপন্থী ছিল।

কাজেই সাক্ষাৎকারটি চূড়ান্তভাবে 'অসফল' হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য।

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গেই কথামৃত গ্রন্থটি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা যায়। তথাকথিত শ্রুতিধর শ্রীম র ওপর অভিযোগ তিনি একটি কি দুটি শব্দ থেকে অনেক পত্রপল্লব বিস্তার করেছেন। যাকে সোজা কথায় ফেনানো বলা যায়। এই ফেনানো যে অনেকক্ষেত্রে ভক্তসুলভ এবং সত্যের উলটো দিকে গিয়েছে সেটাও অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

যেখানে শ্রীমর সমকালীন ভক্তরাই কথামৃতকে খুব trustworthy মনে করতেন না। রামকৃষ্ণ র কথিত গ্রাম্য slang ও গালিগালাজ গুলি অনেকক্ষেত্রে বাদ গেছে। নিশ্চিতভাবেই গুরুকে glorify করতে। কথামৃতের পূর্ব সংস্করণে 'শালার পন্ডিত' কথাটি ছিল। এখন সেটি অবশ্য edit out হয়েছে। এরকম আরো নানা ক্ষেত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্র র সঙ্গে গদাধরের সাক্ষাৎ বিষয়টিতে প্রথমে শ্রীম নিজ উপস্থিতির কথা বললেও পরের সংস্করণে তার উপস্থিতি না থাকার কথা জানান। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র - গদাধর সাক্ষাৎকারের মন্তব্যগুলি, বিশেষত বিদ্যাসাগরের ভক্তসুলভ আপনি আজ্ঞা জাতীয় মাখোমাখো মন্তব্যগুলি কতখানি সত্যি আর কতখানি রঙচড়ানো তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে পারম্পর্য ও চরিত্রবিশ্লেষণ করে ভক্তরচিত কেতাবগুলি পড়লে বিষয়গুলি আরো স্পষ্ট হতে থাকবে।

পুস্তক সহায়তা - প্রাগুক্ত।

(১) শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, লেখক- শ্রীম,প্রকাশক- উদ্বোধন

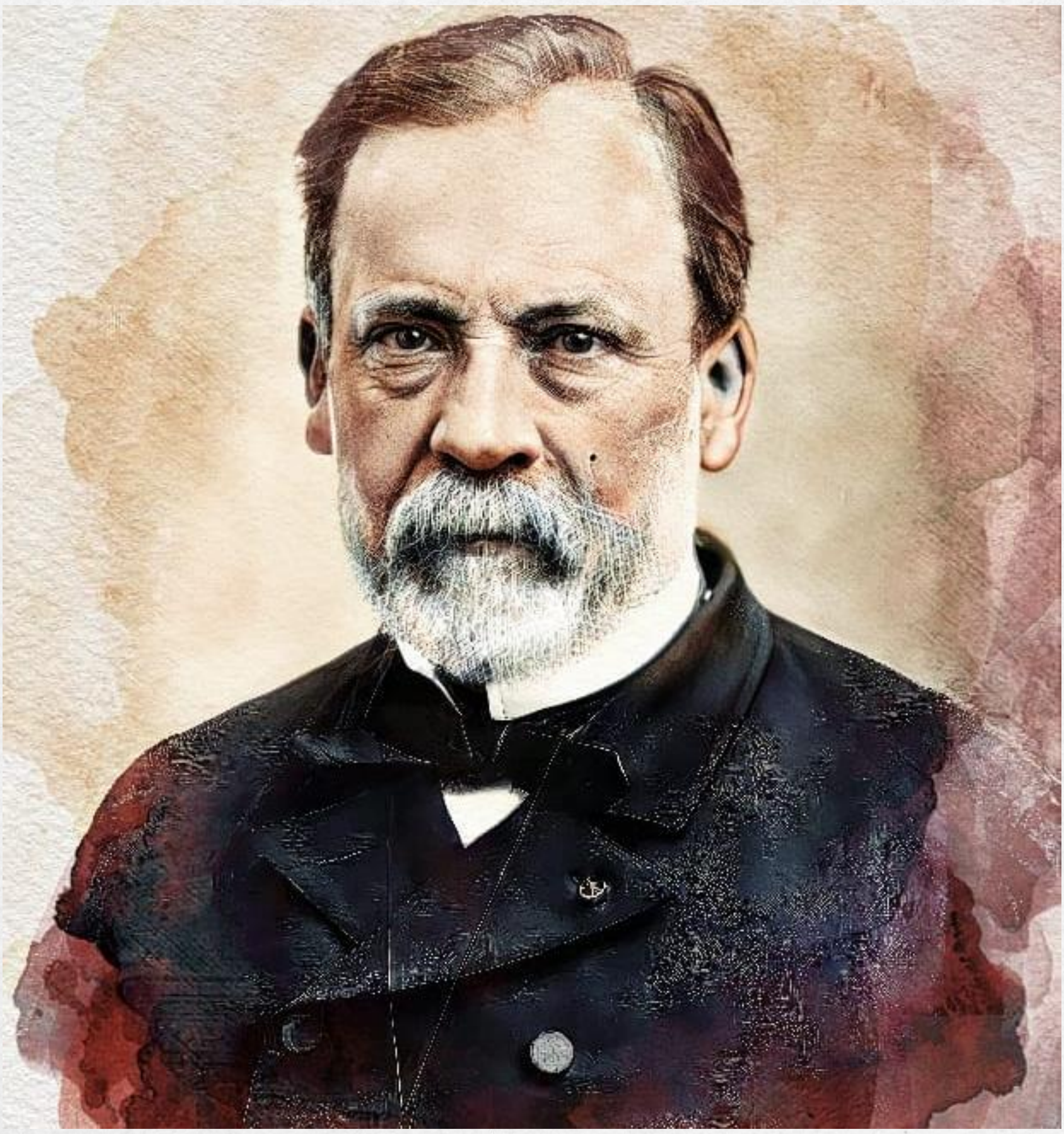
(২) কামারের এক ঘা, লেখক- রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রকাশক- পাভলভ ইন্সটিটিউট

ছবি ঋণ - ড্রয়িং অ্যাকাডেমি।

বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর

লিখেছেন – পার্থ সারথি চন্দ্র

"আমি সমস্ত জীবন ধরে বিশ্বাস করেছি একমাত্র বিজ্ঞান আর শান্তির চেতনাই পারে সমস্ত অজ্ঞানতা আর যুদ্ধের বিভীষিকাকে দূর করতে। ... বিশ্বাস রাখুন এক দিন সমস্ত দেশই সম্মিলিত হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি সহযোগিতার পক্ষে আর সেই ভবিষ্যৎ হবে বর্বরদের নয়, শান্তিপ্রিয় মানবজাতির।"



কথাগুলো প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের (Louis Pasteur)। তোমরা কি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নাম শুনেছ? তিনি একজন ফরাসি জীববিজ্ঞানী, রসায়নবিদ তথা

অণুজীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ যিনি পাস্তুরায়ন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, জীবাণুতত্ত্বের প্রবক্তা ও অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কারক হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো মানবজাতির ইতিহাসে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে এবং আজও রাখছে। লুই পাস্তুর ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফ্রান্সের জুরা প্রদেশের দোল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বেড়ে ওঠেন আরবোয়া শহরে। তাঁর দরিদ্র পিতা বাবা জাঁ জোসেফ পাস্তুর সেখানকার একটি ট্যানারিতে কাজ করতেন। পাস্তুরের মায়ের নাম জাঁ এটিয়েনেট রোকুই। পাস্তুর বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান ছিলেন।

শৈশবে গ্রামে বেড়ে ওঠা পাস্তুরকে যখন তাঁর পিতা প্যারিসের একটি স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য ভর্তি করলেন, তখন কিছুতেই শহরের পরিবেশে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ১৮৩১ সালে পাস্তুরের প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত সাধারণ মানের ছিলেন তিনি। পড়াশোনার থেকে আঁকা এবং মাছ ধরাতেই বেশি আগ্রহ ছিল তাঁর। স্কুল শিক্ষা শেষ করে পাস্তুর ১৮৩৯ সালে কলেজে খুব অল্প সময়েই নিজেকে মানিয়ে নিলেন। তাঁর মেধা অধ্যবসায় পরিশ্রম শিক্ষদের দৃষ্টি এড়াল না। স্কুল শিক্ষা শেষ করে পাস্তুর ১৮৩৯ সালে কলেজ রয়্যাল অব বিসানকোন (Collège Royal at Besançon)-এ

দর্শন পড়তে ভর্তি হন এবং ১৮৪০ সালে সেখান থেকে স্নাতক হন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে নিজের কলেজেই শিক্ষকতায় যুক্ত হলেন, পাশাপাশি বিজ্ঞানে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকলেন।



বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে পাস্তুরের প্রিয় বিষয় রসায়ন। চাকরির পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে গবেষণাও চালিয়ে যান। ১৮৪৭ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের দুটি থিসিস জমা দেন এবং একই বছর দুটি বিষয়েই ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। রসায়নের উচ্চতর শিক্ষায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। এরই মধ্যে পাস্তুরের বিজ্ঞানচর্চায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের কন্যা মেরি লরেন্তের সঙ্গে পরিচয়। ২৯ মে ১৮৪৯ সালে তারা বিয়ে করেন। তাঁদের পাঁচ সন্তানের তিনজনই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে টাইফয়েডে মারা যায়। এ ঘটনায় মুষড়ে না পড়ে, এর প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন পাস্তুর। স্ত্রী মেরি ছিলেন তাঁর যোগ্য সহচরী, সহমর্মী, সহকর্মী এবং সহধর্মীও বটে। ১৮৫৪ সালে লুই পাস্তুর 'লিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে'র বিজ্ঞান বিভাগে ডিন এবং প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। লিলে অঞ্চলে ছিল মদ তৈরির অসংখ্য

কারখানা। দীর্ঘদিন উৎপাদিত মদ ভালো রাখতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল মালিক এবং সরকার। পাস্তুর গবেষণা করে বের করলেন কী কারণে মদ নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য তিনি আবার গবেষণা করতে থাকেন। গবেষণায় সফল হলেন।



আকৃতি ৩ পাস্তুর ও মেরি

তিনি তাঁর গবেষণার মাধম্যে প্রমাণ করে দেখান অ্যালকোহল উৎপাদন ইস্টের পরিমানের উপর নির্ভর করে। তিনি এও প্রমাণ করেন মদের অম্লতার জন্য ব্যাক্টেরিয়াই দায়ী। তৎকালীন সময়ে ফ্রান্সের মদ ব্যবসা মদের অম্লতার কারনে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হত। পাস্তুর মদের স্বাদ অপরিবর্তিত রেখে ব্যাক্টেরিয়া মুক্ত করার জন্য গবেষণা শুরু করে লক্ষ্য করেন উষ্ণ মদে ব্যাক্টেরিয়া টিকতে পারেনা অথচ মদের স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে। পাস্তুর একই পদ্ধতি দুধের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন এবং সাফল্য পান। পাস্তুরের আবিষ্কৃত এই এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী এখন ব্যবহৃত হয় যা 'পাস্তুরায়ন' নামে বিখ্যাত।

পাস্তুর মদে ব্যাক্টেরিয়ার উৎস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন যখন তখন অনেকের ধারণা ছিল ব্যাক্টেরিয়া নির্জীব বস্তু থেকে নিজে থেকেই জন্ম নেয় যদিও এই মতের বিপক্ষেও অনেকে বিজ্ঞানী ছিলেন। পাস্তুর প্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান, নির্জীব বস্তু থেকে ব্যাক্টেরিয়া বা কোন প্রাণ জন্ম নিতে পারে না। পাস্তুর তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন জীবাণুমুক্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রাণ কখনোই নিজে থেকে সৃষ্টি হয়না।

পাস্তুরের পরীক্ষা স্বতঃজননবাদকে (Theory of spontaneous generation) ভুল প্রমাণ করেছে। স্বতঃজননতত্ত্বের দাবীদারদের সবাই বিশ্বাস করতেন জটিল জীব তার পূর্ণ অবয়বে নিজে নিজেই 'সৃষ্টি' হয়। যেমন, এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন কিছু মাছ এবং পতংগের মত ছোট প্রানী স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভূত হয় । ব্রিটিশ গবেষক আলেকজান্দার নীডহ্যাম (১১৫৭-১২১৭) বিশ্বাস করতেন ফার গাছ সমুদ্রের লবণাক্ত জলেতে ফেলে রাখলে তা থেকে রাজহাঁস জন্ম নেয়। জ্যান ব্যাপটিস্ট হেলমন্ট (১৫৮০-১৬৪৪) ভাবতেন ঘর্মাক্ত নোংরা অন্তর্বাস ঘরের কোনায় ফেলে রাখলে তা থেকে ইঁদুর আপনা আপনিই জন্ম নেয়। বিজ্ঞানী পুশে (১৮০০-১৮৭২) বিশ্বাস করতেন খড়ের নির্যাস থেকে ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীব স্বতঃস্ফুর্তভাবেই জন্ম নেয়। পাস্তুরের গবেষণা মূলতঃ এই ধরনের 'সৃষ্টিবাদী' ধারণাকেই বাতিল করে দেয়। কিন্তু

পাস্তুরের পরীক্ষা কিংবা জৈবজনির কোন সূত্রই বলে না যে, প্রাথমিক জীবন জড় পদার্থ থেকে তৈরি হতে পারবে না

ফ্রান্সে এক মহামারীতে রেশম পোকার উৎপাদন হ্রাস পেলে ফরাসি সরকার পাস্তুরকে রেশম শিল্পের এই সমস্যা সমাধানে আহ্বান জানায়। পাস্তুর লক্ষ্য করেন রেশম পোকার এই সমস্যা বংশগত এবং মায়ের থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রামিত হয়। তিনি প্রস্তাব করেন কেবলমাত্র রোগ মুক্ত গুটি বাছাই করার মাধ্যমে একমাত্র রেশম শিল্পকে বাঁচানো সম্ভব।

পাস্তুর তাঁর বিখ্যাত জীবাণু তত্ত্বে (Germ Theory) প্রমাণ করে দেখান কিছু রোগের জন্য অণুজীব দায়ী, যারা জল ও বাতাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। তিনি তাঁর জীবাণু তত্ত্বে দেখান অণুজীব বৃহদাকার জীবকেও আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পাস্তুরই প্রথম অ্যানথ্রাক্সের টিকা আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন একমাত্র গৃহপালিত পশুর দেহেই অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলি (Bacillus anthrasis)-র আক্রমণে অ্যানথ্রাক্স রোগ সৃষ্টি হয়।

অ্যানথ্রাক্সের টিকা আবিষ্কারের পর পাস্তুর অন্যান্য রোগের প্রতিরোধের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তিনি জলাতঙ্ক রোগের ওপর গবেষণা করে দেখেন এই রোগের জীবাণু আক্রান্তের স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পশুর

মেরুদণ্ডের নির্যাসের মাধ্যমে অন্য প্রাণীদেহে জলাতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পাস্তুর রোগ প্রতিরোধে অক্ষম জলাতঙ্ক ভাইরাস সৃষ্টি করেন, যা জলাতঙ্কের টিকা হিসেবে ব্যবহার হয়। ১৮৮৫ সালে পাস্তুর প্রথম এক শিশু বালকের ওপর এই টিকা প্রয়োগ করেন। লুই পাস্তুর কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা আবিষ্কার করেন জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক। এই আবিষ্কার তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। ফরাসি অ্যাকাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি।



লুই পাস্তুর একজন রসায়নের অধ্যাপক হলেও আমৃত্যু কাজ করেছেন অণুজীব নিয়ে। কেমন করে এর উৎপত্তি, কীভাবে এর দ্বারা সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেসব নিয়ে। মানবদরদী মহান এই বিজ্ঞানীর কাজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৮৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর তাঁকে অভিনন্দন জানাতে প্যারিসে সমবেত হলেন দেশবিদেশের বিজ্ঞানীগণ। সম্মান,

উপাধি, পুরস্কার, মানপত্র তাঁর চরিত্র বদলে দেয়নি। তিনি আগের মতোই নিরহঙ্কার, নিরলস, সাদামাটা রয়ে গেলেন। শেষ জীবনে বাইবেল পাঠ আর উপাসনার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞান-সাধক, ১৮৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চিরনিদ্রায় শায়িত হন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ প্যারিসের 'পাস্তুর ইনস্টিটিউটে' স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালন করা হয়। এই মহান বিজ্ঞানীর জন্মদিবসে (২৭ ডিসেম্বর) আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনীশতক, বিশ্বের সেরা ১০১ বিজ্ঞানীর জীবনী, রোর মিডিয়া, কালের কণ্ঠ, সব বাংলায়, ইন্ডিয়া টুডে ডট ইন, ফ্রন্টিয়ারসীন ডট ওআরজিও, ব্রিটানিকা ডট কম ও উইকিপিডিয়া।

ইতিহাসের চাকা চলে আপন গতিতে

লিখেছেন – রাহুল রায়



আরও একটি ২৩শে জানুয়ারি দরজায় কড়া নাড়ছে। প্রতিবারের মতো এবারও পাড়ায় পাড়ায় নেতাজী স্মরণ করা হবে। বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। নেতাজীর ছবি, তাঁর বাণী, তাঁর বীর গাঁথায় সাজানো ছবি, লেখা দিয়ে ভরে থাকবে সবক'টি অনুষ্ঠান মঞ্চ। সেদিন শাসক – বিরোধী – ছদ্ম বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সামাজিক মাধ্যমের প্রফাইলে নেতাজীর ছবি ও নামটি কিছু সময়ের জন্য জ্বলজ্বল করবে। এরপরেই শুরু হবে নেতাজীকে নিয়ে এদের তরজা। শাসক দল ১৯৪০ সনে কংগ্রেস থেকে তাঁর বহিষ্কার প্রশ্নে তাঁকে অকংগ্রেসী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা

হিসাবে তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। হয়তো এবারও প্রধানমন্ত্রী মহোদয় স্বয়ং নেতাজীর টুপি পড়ে এই মর্মে বক্তৃতা দেবেন। সংবাদমাধ্যম নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক রঙে নেতাজীকে রাঙানোর চেষ্টা করবে। যার অধিকাংশের রঙ আবার শাসক দলের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এর বিপরীতে নেতাজীর অসাম্প্রদায়িক, সাম্যবাদী, প্রগতিশীল মনন নিয়ে বিরোধীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তবে এই সবই কিন্তু ওই একদিনের জন্যই। ২৩ জানুয়ারি যেতেই আবার সব যে যার জায়গায় চলে যাবে। পরের বছর আবার সেই একই চিত্র নতুন মোড়কে জনসমক্ষে পরিবেশিত হবে।

বলতে বাধা নেই এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যাই করুক না কেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আপামর ভারতবাসী থেকে যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পেয়েছেন সেটা তার আগে বা পরে কারোর কপালেই জুটেনি। হওয়ার কথাও নয়। ক্ষমতার অলিন্দে থেকে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনের সুযোগ যখন তার পাদদেশে অপেক্ষা করছিল তিনি তখন সেই সুযোগকে চরম অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশ

ও আপামর দেশবাসীর স্বাধীনতা। শুধু দেশ বা একটি ধর্মে বিশ্বাসী বা ভাষায় কথা বলা মানুষের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এখানে দেশের স্বাধীনতা ও দেশ ও দেশবাসী স্বাধীনতার পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া দরকার। উভয়ের মধ্যে শব্দের ব্যবধান বেশি না হলেও অর্থগত পার্থক্য বিরাট। প্রথমটিতে আমরা ফ্যাসিস্ট সুলভ চিন্তা পাই যেখানে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই শেষ কথা, রাষ্ট্রই সর্বময়, মানুষ সেখানে রাষ্ট্রের নামে পরিচালকদের অনুগত প্রজাবৃন্দ, সেবক, তাদের প্রয়োজন, চাহিদা অনেকটাই গুরুত্বহীন। দ্বিতীয়টিতে পাই সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বার্তা। রাজনৈতিক ভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও তার মধ্যে থাকা একটি শিক্ষিত, রুচিশীল, প্রগতিশীল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন সমাজ। যেখানে প্রজার সর্বাঙ্গীন উন্নতিই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। আজকের শাসকরা নেতাজীকে প্রথমটির সমর্থক হিসাবে তুলে ধরে নিজেদের পাশে আনতে চাইছেন। এজন্য অহরহ ব্যবহার করা হচ্ছে সব রকমের কূট কৌশল। অথচ বাস্তবটা হল তিনি প্রথমটির অর্থাৎ অন্ধ জাতীয়তাবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এতটাই যে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফ্যাসিস্ট সাহায্য নিয়েও হিটলারের বিরোধীতা করতে তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বায় লাগাম পড়েনি। স্বাধীন ভারতে তিনি থাকলে

আজকের রাজনীতি আর যাই হোক, বর্তমান অবস্থায় যে থাকতো না তা হলফ করে বলা যায়।



নেতাজীর জীবনে নিয়ে নিঃসন্দেহ জনমানসে সবচেয়ে কৌতুহল উদ্দীপক পর্ব সম্ভবত ১৯৪৫ সনের ১৮ আগষ্ট ও তার পরবর্তী অংশ। জাপানি সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে ২১ আগষ্ট পৃথিবী জানতে পারে যে ১৮ আগষ্ট তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার পথে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু হয়েছে।



LATE CITY EDITION

BELTINGS PICKING-BANDS THE BELTING HOUSE

Hindusthan Standard

PURCHASE BRANDED LUBRICANTS AND BE SURE OF GETTING THE BEST Sternol MARTIN & CO.

VOL. VIII, NO. 226 — CALCUTTA — FRIDAY, AUGUST 24, 1945, BHADRA 7, 1352 B. S. — PRICE TWO ANNAS

MR. SUBHAS CHANDRA BOSE DEAD

SUCCUMBS TO INJURY FROM AIR CRASH

ANNOUNCEMENT BY JAP NEWS AGENCY

LONDON, AUG. 23.—The death of Mr. Subhas Chandra Bose is announced today by the Japanese News Agency.

The Agency added that Mr. Bose died in a Japanese hospital from injuries received in an air crash.

A LIFE SKETCH

Leaders' Sorrow

NEHRU CAUTIONS BRITAIN

CONCERN OVER INDIAN NATIONAL ARMY

"IT WOULD BE TRAGEDY IF THEIR PRECIOUS LIVES PERISH"

Late News

HUNGRY & EXPLOITED INDIA A TEST CASE FOR BRITISH LABOUR

"CHURCHILLS OF COLONIAL POWERS PLOTTING

তবে এই খবরের মধ্যে এতোই ত্রুটি ও পরস্পর বিরোধীতা ছিল যে অচিরেই সাধারণ মানুষের

মধ্যে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু কেউই এই ঘটনাকে মেনে নিতে পারেননি। নেতাজী অনুরাগী দেশবাসীর কথা তো বলেই লাভ নেই। সময়ে সময়ে তাঁকে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখতে পাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে ধোঁয়াশাঘেরা করে রাখে। আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নেতাজীর সমসাময়িক সব নেতাই প্রায় গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সরকারী নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রায় কোনো রকম দৃঢ় প্রমাণ ছাড়াই একজন রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ সেনানী শাহানুয়াজ খান কমিশন, বিচারক জি ডি খোসলা কমিটিও সরকারের বক্তব্যেই সায় দেয়। উল্লেখযোগ্য যে এরা কেইই তাইহোকুতে যাননি। অবশেষে ১৯৯৫ সনে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিচারক মনোজ কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে ঘটিত কমিশন তাইহোকু বা বর্তমান তাইওয়ান ঘুরে এসে জানায় যে যা তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কার ১৮ আগষ্ট কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়নি এবং নেতাজী স্বাভাবিক ভাবেই তারপরেও বেঁচে ছিলেন। তখন দেশে শাসনাধিষ্ঠিত

কংগ্রেস সরকার। ২০০৬ সনে তারা মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে সংসদে নাকচ করে দেয়।

২০১৪ সনে দেশের শাসনে পরিবর্তন আসে। নেতাজী অনুরাগী সহ দেশবাসীর মনে একটি আশা জাগে যে এবার বোধহয় দেশনায়কের জীবনের ওপর থাকা রহস্যের আবরণ সরানো হবে। সরকারও এই ব্যাপারে তৎপর হয়ে নেতাজী সম্পর্কিত সব গোপন নথী জনগণের সামনে তুলে ধরবে বলে জানায়। কথামতো ফাইলগুলোকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তুলেও ধরা হয়। একই পথ নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। অর্থাৎ সরকারের কাছে এই মর্মে আজ আর কোনো নথী গোপন নেই। সমস্যা হল যা নথী বেরিয়ে আসল তাতে সেই রহস্যের ওপর থেকে এই মিলিমিটার আবরণও কিন্তু সরানো গেল না। নেতাজী ১৯৪৫ সনে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন কি না রহস্যটি রহস্যই থেকে গেল। এমনকি কংগ্রেস সরকার বিচারক মনোজ কুমার মুখার্জির যে রিপোর্টটি নাকচ করে দেয় বর্তমান সরকার সেই রিপোর্টটি নিয়ে গত আট বছরে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্তম্ভটিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন কিন্তু তাঁর অধীনস্থ

সরকার আজও দেশবাসীকে বলতে পারেনি যে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে আদ্য কতজন সেনানী ছিলেন, কতজনই বা শহীদ হোন, কেন আজও তাঁদের বীরত্বের ইতিহাসকে সেনাবাহিনীর ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পদে পদে ইতিহাস বদল করা হলেও এই ব্যাপারে সরকার জগন্নাথের ভূমিকাতেই স্বচ্ছন্দ। কিছুদিন আগে নেতাজীর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বাইক রেলীর অংশ হয়ে মৈরাঙ যাওয়া হয়েছিল। সেখানে জাপানী সেনানীদের সম্মানার্থে জাপান সরকার স্মৃতিসৌধ বানিয়ে রেখেছে, নাগাল্যান্ডের কোহিমা শহরে ব্রিটিশ সরকার একই কাজ করেছে। অথচ এই দুই শহরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের উদ্দেশ্যে কোনো সৌধ নেই। ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই করেনি। নাগাল্যাণ্ডের ফেক জেলার চেসেজু গ্রাম নেতাজীর স্মৃতি সগর্বে বহন করে চলেছে। ভারতের ভেতরে এই গ্রাম পর্যন্তই নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে আসতে পেরেছিলেন। সেখানে স্থানীয় মানুষ নেতাজী স্মৃতিতে একটি পাহাড়ের নামকরণ করেছিলেন। আজও প্রতিবছর শ্রদ্ধা, আবেগে এখন ঘটা করে নেতাজী স্মরণ করা হয়। তবে সরকারী সাহায্য, স্বীকৃতি ছাড়া সেখানের মানুষ কতদিন নেতাজী তথা

আজাদ হিন্দ বাহিনীর অমূল্য স্মৃতিচিহ্নগুলোকে কালের করাল থাবা থেকে রক্ষা করতে পারবেন সেটাই বড় প্রশ্ন।

নেতাজী সুভাষ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস থেকে কোনোকালেই যোগ্য ব্যবহার পাননি। জওহরলাল নেহেরুর উত্তরসুরীরা একই পথ ধরে নেতাজী বিরোধিতা করে গেছেন। এতে অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু তা বলে নেতাজী ডানপন্থী, হিন্দুত্ববাদী বা অন্ধ জাতীয়তাবাদী ছিলেন বলে মেনে নেওয়া বা তার প্রচার করা নেতাজী তথা এদেশের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার নামান্তর হবে। সেরকমই কিছু বিশ্বাসঘাতক অহরহ প্রচার করে চলেন যে সমসাময়িক হিন্দুত্ববাদী নেতাদের দেখানো পথেই নাকি নেতাজী সুভাষ ও মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানের মাটিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের সঙ্গে নেতাজীর দেখা করার ঘটনাটির উল্লেখ তাঁরা এই মর্মে করে থাকেন। অথচ একই সময়ে নেতাজী মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহের সঙ্গেও দেখা করেন। উভয়ের কাছে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একই। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের সহযোগিতা চাওয়া। সেদিন উভয়েই নেতাজীকে ফিরিয়ে দেন। স্বরচিত

The Indian Struggle পুস্তকে যার বিস্তারিত বিবরণী তিনি দিয়েছেন। নেতাজীর কাছে দেশের স্বাধীনতার থেকে বড় কোনো আদর্শ ছিল না, যার জন্য পরবর্তীতে তিনি কমিনিস্ট সোভিয়েত ও ফ্যাসিস্ট জার্মানীর কাছেও যান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধে কমিনিস্ট রাশিয়া নেতাজীকে সমর্থন না করলেও তাঁর বিরুদ্ধাচারণও কোনোদিন করেনি। জার্মানি ও জাপান, দুই ফ্যাসিস্টবাদী দেশের সাহায্যই তিনি পেয়েছেন। এমনকি ইস্লামিক জাতীয়তাবাদী মুসলিম লিগ পরবর্তীতে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমর্থনে আসলেও হিন্দু মহাসভা বা অন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলো কিন্তু সুভাষ বিরোধীতার পথ থেকে কোনোদিন সরে আসেনি। আজ তাঁদের উত্তরসূরীরাই দেশের শাসনে এবং আশ্চর্যজনক ভাবে এরা জওহরলাল নেহেরুর দৈন্য মানসিকতার সূযোগ নিয়ে নেতাজীকে নিজেদের শিবিরে আনতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইতিহাসের শাস্তি বোধহয় একেই বলে, যাকে একদিন রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজ তাঁকেই নিজেদের পাশে আনতে নিজেদেরই ইতিহাস ভূলে যেতে হচ্ছে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হচ্ছে না ।

সূচিপত্র

নাস্তিক এবং আস্তিক

লিখেছেন – জসিমুদ্দিন আহমেদ

(নভেম্বর সংখ্যার পর)



ঈশা বাস্যমিদংসর্বম্ য়ৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগত্।

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।

এই মন্ত্রটির মধ্যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতার বর্ণনা আছে যে সৃষ্টির সমস্ত চর আর অচর ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ সে প্রত্যেক অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত।

(য়জুর্বেদ অধ্যায় ৪০ এর প্রথম মন্ত্র)

বিশ্বাস হচ্ছে, সোজা কথায় যুক্তিহীন কোন ধারণা, অনুমান, প্রমাণ ছাড়াই কোন প্রস্তাব মেনে নেয়া। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য-প্রমাণ, পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় মানুষের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। যখনই কোনো কিছু যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা লব্ধজ্ঞান হয়ে উঠবে, তা আর বিশ্বাস থাকবে না। যেমন ধরুন, পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণে তৈরি। এটা মানুষের বিশ্বাস নয়, এটা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল। আপনাকে এই কথাটিতে বিশ্বাসী হতে হবে না। কারণ কে এতে বিশ্বাস করলো কে করলো না, তাতে এই তথ্যের সত্যতার কিছুই যায় আসে না। এটা উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমরা কেউ বলি না “পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রন, এই কথা আমি বিশ্বাস করি”; এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই নয়। বা ধরুন, পৃথিবী গোল, এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি মেনে নিই উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের আলোকে। এটা এখন আর অনুমান বা বিশ্বাস নেই, এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সত্য। বা ধরুন বিবর্তনবাদ। এটা কোন অনুমান নয়। বর্তমানে এটি

পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

বিশ্বাস সেটাই করতে হয়, যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বা যার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ধরুন কেউ ভূতে বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে এলিয়েন পৃথিবীতেই আছে, কেউ জ্বীন পরী, কেউ আল্লা, কেউ জিউস কালী ইত্যাদি। এগুলো বিশ্বাসের ব্যাপার, কিন্তু আমরা আলোতে বিশ্বাসী নই, আমরা সূর্যে বিশ্বাসী নই, আমরা চেয়ার টেবিলে বিশ্বাসী নই। কারণ এগুলো বিশ্বাস অবিশ্বাসের উর্ধ্বে। আমরা বলি না অমুক লোক সূর্যে বিশ্বাসী, তমুক লোক চেয়ার টেবিলে বিশ্বাস করে। আমরা বলি মুসলিমরা আল্লায় বিশ্বাসী, হিন্দুরা শিব বা দুর্গায়, কেউ শাকচুন্নীতে বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে আমাদের চারপাশে জ্বীন পরী ঘুরে বেড়ায়।

ধরুন, আগামীকাল একটি পত্রিকায় ছাপা হলো যে, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মেরকেল একজন এলিয়েন। এই তথ্যটি জানার পরে আমি নিচের কাজগুলো করতে পারি।

১) আমি তথ্যটি জানলাম বা শুনলাম, এবং বিশ্বাস করলাম।

২) আমি আরও কয়েকটি নিরপেক্ষ পত্রিকা পড়লাম, এবং ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যম থেকে এর সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করলাম। দেখা গেল, আরও কিছু পত্রিকা

কথাটি লিখেছে। আমি সেই অবস্থায় কথাটি বিশ্বাস করলাম।

৩) আমার এইসব পত্রিকার কথা বিশ্বাস হলো না। আমি সরাসরি অ্যাঞ্জেলা মেরকেলের সাথে দেখা করতে গেলাম, এবং সরাসরি দেখলাম যে, উনি একজন এলিয়েন। দেখার পরে আমি মেনে নিলাম। যেহেতু সরাসরিই দেখা, তাই আর বিশ্বাসের অবকাশ নেই। তবে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে।

৪) আমি শুধু দেখেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নই। পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হতে চাই। তাই আমি পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম। তখনও আমার আর কথাটি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের অবকাশ নেই। আমি শতভাগ নিশ্চিত। আমি তথ্যটি মেনে নিলাম।

অন্যদিকে নাস্তিকতা হচ্ছে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রসঙ্গে শূন্য বিশ্বাস। ন্যুল বিশ্বাস। বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রস্তাবকে বাতিল করা।

Atheism, in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. As such, it is usually distinguished from theism, which affirms the reality of the divine and often seeks to demonstrate its existence.

অর্থাৎ এটা “ঈশ্বর নেই”- তাতে বিশ্বাস করা নয়। বরঞ্চ “ঈশ্বর আছে”, সেই প্রস্তাবকে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে বাতিল করা এবং সেই বিশ্বাসের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা। ঈশ্বর নেই, সেটা বিশ্বাস করা আর ঈশ্বর আছে, এই প্রস্তাবনাকে প্রমাণের অভাবে বাতিল করা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নাস্তিকতা কোন বিশ্বাস বা ধর্ম নয়, বরঞ্চ নাস্তিকতা হচ্ছে অবিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে আস্থাহীনতা।

যেমন ধরুন, স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা একজনের শখ। অন্য আরেকজনের নয়। যার নয়, তার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না যে, স্ট্যাম্প কালেকশন না করা হচ্ছে তার শখ। বা ধরুন কেউ টিভিতে কেউ কোন চ্যানেল দেখে। যখন কোন চ্যানেল আসছে না, কোন সিগান্যাল আসছে না, সেটাকে আমরা আরেকটি চ্যানেল বলতে পারি না। সেটা হচ্ছে সিগন্যালের অনুপস্থিতি। শূন্য সিগন্যাল। যেমন আলো হচ্ছে সাতটি রঙের মিশ্রণ। আলোর অনুপস্থিতিকে আমরা অন্ধকার বলি। সেটাকে আরেক রকমের আলো বলি না। বা আরেকটি রঙ বলি না।

বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বাসীগণ কিছু অসৎ যুক্তি তুলে ধরেন। যেমন, প্রমাণ করুন, ঈশ্বর নেই! বা নাস্তিকরা কী প্রমাণ করতে পারবে যে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই?

এই যুক্তিটি অসৎ এবং একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি বলে সারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত। কারণ, যে দাবি উত্থাপন

করবে, প্রমাণের দায়ও তার ওপরেই বর্তায়। অন্য কেউ বিষয়টি অপ্রমাণ করবে না।

(ফ্যালাসি দুই ধরনের, এই বিষয়ে পরবর্তীতে লিখবো।)

এটা নাস্তিকদের দায় নয়। যে ঈশ্বরের প্রস্তাব উত্থাপন করবে, তা প্রমাণের দায় তার ওপরই বর্তায়। সে সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ হাজির না করতে পারলে সেটা বাতিল করে দেয়াই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। সেটাই দর্শনের মৌলিক অবস্থান। সেই প্রস্তাব যত জোর গলাতেই উত্থাপন করা হোক না কেন, সেটা অপ্রমাণ করার দায় নাস্তিকদের নয়। যেমন কেউ যদি দাবি করে, বৃহস্পতি গ্রহে মানুষ রয়েছে, বা সে নিজেই ঈশ্বর, এই মহাবিশ্ব সে নিজেই সৃষ্টি করেছে, বা তার বাসার পুকুরের ব্যাঙটিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে! তাহলে এরকম প্রস্তাবের প্রমাণ তাকেই করতে হবে। অন্যরা বৃহস্পতি গ্রহে গিয়ে তার প্রস্তাব অপ্রমাণ করবে না, বা সে যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি, তা অপ্রমাণ করবে না। যতক্ষণ সে তার প্রস্তাবের সপক্ষে উপযুক্ত তথ্য এবং যুক্তি উপস্থাপন করতে না পারছে, শুধু "মৃত্যুর পরে" সব প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে দাবী করছে, তার বা তাদের দাবিকে আমলে নেয়ার প্রয়োজন নেই। আর তা প্রমাণ করতে পারলে, বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে, আগামীকাল পৃথিবীর সমস্ত যুক্তিবাদী নাস্তিকের দল বেঁধে আস্তিক হতে কোন বাধা নেই।

আমরা বলি, ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার আসলে সমার্থক।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ নানা ধরণের প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসু মন, কৌতূহলী মনে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ধরুন, বৃষ্টি কেন হয়, ফসল কীভাবে জন্মায়, মানুষ জন্মে, পৃথিবী কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, ইত্যাদি। কিছু বিষয় মানুষ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে জানতে পেরেছে, কিছু কিছু বিষয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে, উপযুক্ত তথ্যের অভাবে বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে মানুষ আরও জ্ঞান অর্জন করেছে, আরও বেশি জেনেছে।

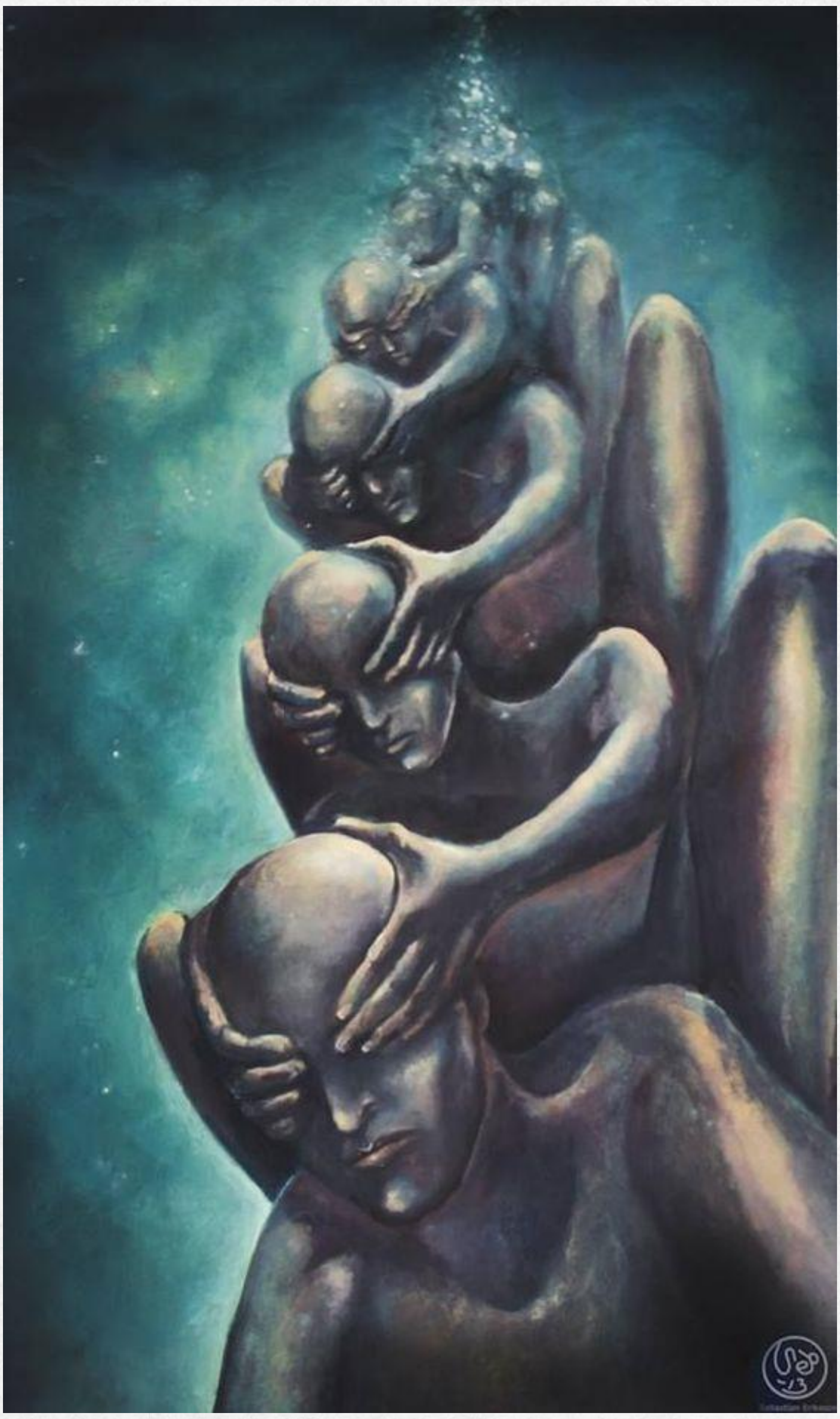
আর যেগুলো সম্পর্কে মানুষ জানতে পারেনি, সেই সময়ের জ্ঞান যে পর্যন্ত পৌঁছায়নি, সেগুলো সম্পর্কে মানুষ ধারণা করেছে, কল্পনা করেছে। যেমন, যখন মানুষ জানতো না বিদ্যুৎ কীভাবে চমকায়, তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এই সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ছিল না, তাই যখন কেউ প্রস্তাব করে এটা ভয়ঙ্কর কোন দেবতার কাজ, সেই প্রস্তাবই অন্য কোন যৌক্তিক প্রস্তাবের অনুপস্থিতির কারণে, বা সেই সময়ের মানুষের জ্ঞানের অভাবের কারণে মানুষগুলোর মধ্যে টিকে গেছে। এর পেছনে কাজ করেছে অজানার প্রতি ভয়, এবং লোভ। সেই সময়ে হয়তো কেউ দাবি করেছে, সে নিজে হচ্ছে ভয়ঙ্কর দেবতাটির পুত্রও, বা প্রিয় বন্ধু, বা আত্মীয়স্বজন, এবং এইসব দাবির মাধ্যমে সে সমাজে

সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। ধীরে ধীরে সেটাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে রূপ নিয়েছে। মানুষের মাঝে অজ্ঞানতা, জানতে না পারার হতাশা, অজ্ঞতা একধরনে হীনমন্যতায় রুপ নেয় এবং ধীরে ধীরে অজ্ঞানতার অন্ধকার একপর্যায়ে দেবতা, ঈশ্বর, ভূত নামক কল্পনা দিয়ে তারা ভরাট করে ফেলে। যেমন তারা ধরে নিয়েছে, বিদ্যুৎ চমকানো হচ্ছে দেবতা জিউসের ক্রোধ। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞান উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহকারে বের করেছে, বিদ্যুৎ কীভাবে চমকায়। তার পেছনে কোন দেবদেবী ঈশ্বর আল্লাহর হাত আছে কিনা। সেই সব অপ্রমাণিত বিশ্বাসের সমষ্টিই বা বিশ্বাসগুলোর বিবর্তিত রূপই হচ্ছে আজকের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো। আধুনিক ঈশ্বরগুলো। পুরনো ঈশ্বরদের বিবর্তন ঘটে গেছে। পুরনো অনেক প্রবল প্রতাপশালী দেবতা ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাসই সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আধুনিক ধর্মগুলোও একসময় বিলুপ্ত হবে।

নাস্তিকতা এই প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তারা তা অস্বীকার করে। প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাতিল করে। এটি কোনো ভাবেই আরেকটি বিশ্বাস বা ধর্ম নয়। বরঞ্চ ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। একটি যৌক্তিক অবস্থান। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর বা স্রষ্টার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। পাওয়া গেলে, তা মেনে নিতে এক

মূহুর্ত দেরী হবে না। তখন আর তা বিশ্বাস করতেও হবে না। মেনে নেয়া হবে।

বস্তুত, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং আমার বাসার ডোবার ব্যাঙটিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে, এই দুটো দাবীর সপক্ষেই ঠিক একই মানের প্রমাণ দেয়া সম্ভব। তাই তা বাতিল যোগ্য।



অজ্ঞেয়বাদ শব্দটি ইংরেজি যে শব্দটির পারিভাষিক শব্দ, অর্থাৎ “Agnostic” শব্দটিকে ভাঙলে আসে গ্রিক “a” এবং “gnostos”। gnostos অর্থ জ্ঞানী, আর তার আগে উপসর্গ “a” মিলে agnostic শব্দের আক্ষরিক অর্থ হয়েছে

জ্ঞানহীন। সেই অর্থে একজন ব্যক্তি অনেক বিষয়ে agnostic হতে পারেন। কিন্তু এটার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবহার দেখা যায় ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলায়। যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে, তখন দুটি মৌলিক অবস্থানের সূচনা ঘটে যাদের মধ্যে যেকোন একটিকে গ্রহণ করতে হয়। এটা অনুসারে, হয় আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেন, অথবা অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি অপশনগুলোকে আরও একটু নীরিক্ষণ করেন তাহলে আপনি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মোট চারটি অবস্থান দেখতে পারবেন:

১। জ্ঞেয়বাদী আস্তিক (Gnostic theist): আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং এটা যে সত্য এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান আছে (বা এটা যে সত্য তা আপনি জানেন)।

২। অজ্ঞেয়বাদী আস্তিক (Agnostic theist): আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিন্তু জানেন না যে এটা সত্যি কিনা (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন)।

৩। জ্ঞেয়বাদী নাস্তিক (Gnostic atheist): ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এটা জেনে আপনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন (অর্থাৎ আপনি জানেন যে ঈশ্বর নেই এবং তাই আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না)।

৪। অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক (Agnostic atheist): ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই এটা না জেনেই আপনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন (অর্থাৎ আপনি জানেন না যে ঈশ্বরের

অস্তিত্ব আছে কি নেই কিন্তু আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না।)

তৃতীয় অবস্থানটিকে, অর্থাৎ জ্ঞেয়বাদী নাস্তিক্যবাদ বা Gnostic atheism অবস্থানটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, "আমি বিশ্বাস করি এবং "জানি" যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই"। অন্যদিকে চতুর্থ অবস্থানটিকে, অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক্যবাদ বা Agnostic atheism বলা হয় যা বলে, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এতে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি এটা জানি না যে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সত্য কিনা"। এই দুই দাবীর পার্থক্য সূক্ষ্ম কিন্তু এটাকে বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অবিশ্বাস করা আর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করা এক নয়

একজন নাস্তিক্যবাদীকে ঈশ্বর নেই এটা প্রমাণ করতে বলা হলে এটা ধরেই নেয়া হয় যে সেই নাস্তিক্যবাদী লোকটি "ঈশ্বর নেই" এই কথাটিতে বিশ্বাস করেন। জ্ঞেয়বাদীই নাস্তিক্যবাদীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নাস্তিক্যবাদীদের মধ্যে অনেক অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিকও আছেন যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এটাও নিশ্চিতভাবে দাবি করেন না। দুটোই বৈধভাবে নাস্তিক্যবাদ বা atheism। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে atheism বা নাস্তিক্যবাদ এবং agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ সম্পূর্ণভাবে দুটি আলাদা বিষয় নয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই এটাই কাউকে নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। কোন কিছুতে বিশ্বাসহীনতা মানেই এই নয়

যে এটাকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। এটার কেবল এই অর্থই থাকতে পারে যে এটা যে সত্য সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত নন। উদাহরণস্বরূপ আপনার একজন বন্ধু বিশ্বাস করতে পারে যে ফোর্ড বিশ্বের সবচেয়ে ভাল গাড়ির কোম্পানি। আপনার এই বিষয়ে কোন বিশেষ মতামত বা ভাবনা নেই। আপনি বিশ্বাস করেন না যে ফোর্ড অন্য কোন ব্র্যান্ডের গাড়ির চেয়ে ভাল, কিন্তু এটা যে বিশ্বের সবচেয়ে ভাল গাড়ির ব্র্যান্ড না আপনি এটাও জানেন না। এই পরিস্থিতিতে আপনি আপনার বন্ধুটির দাবির বিষয়ে agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী।

দ্য বার্ডেন অব প্রুফ বা প্রমাণের দায়

ধরুন, আমি আপনার কাছে একটি অসম্ভব দাবি নিয়ে এলাম। সেটা হলো, "আমার কাছে একটি দুই ফুট লম্বা লেপ্রিকন (Leprechaun – রূপকথায় বর্ণিত একধরণের অবাস্তব জীব) আছে। এটা আমার সিন্দুকে থাকে। কেবলমাত্র আমিই এই লেপ্রিকনকে দেখতে পারি আর এই লেপ্রিকনের অস্তিত্বের কোন ফিজিকাল এভিডেন্স নেই।" কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে এই লেপ্রিকনটির কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু আমি এটারও কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারছি না যে এই লেপ্রিকনের কোন অস্তিত্ব আছে। আর এই ধরণের দাবিকেই আনফলসিফায়াবল ক্লেইম (Unfalsifiable claim) বা প্রমাণ-অযোগ্য দাবি বলা হয়।

যখন একটি প্রমাণ-অযোগ্য দাবিকে সামনে নিয়ে আসা হয়, তখন বার্ডেন অব প্রুফ বা প্রমাণের দায় তার উপরের বর্তায় যে ব্যক্তি দাবিটি নিয়ে এসেছেন। অন্যথায় এবসার্ডিটি বা বিমূর্ততার সূচনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ প্রমাণ-অযোগ্য দাবি সংক্রান্ত চিন্তন পরীক্ষণগুলো বা থট এক্সপেরিমেন্টগুলোর (Thought Experiment) কথাই চিন্তা করুন, যেমন "ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার", "ইনভিজিবল পিংক ইউনিকর্ন", স্যাগানের "দ্য ড্রাগন ইন মাই গ্যারেজ" এবং "রাসেলস টিপট" এর অস্তিত্ব। এই প্রত্যেকটি থট এক্সপেরিমেন্টেই পূর্ববর্তী উদাহরণের লেপ্রিকনের মত কোন না কোন আশ্চর্যজনক এবং অসম্ভব প্রাণীর কথা বলা হয়েছে যাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অপ্রমাণ করা যায় না।

আর এখানেই অজ্ঞেয়বাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হয়ে দাঁড়ায়। অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিকগণ স্বীকার করেন যে, তারা ঈশ্বরকে নির্দিষ্টভাবে অপ্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবকে চোখে আঙ্গুলে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

পর্ব - ৩

পূর্বোক্ত পর্বে যুক্তিগুলো কেবল প্রমাণ-অযোগ্য দাবি বা যে দাবিগুলোকে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না তারদের উপরেই প্রয়োগ করা যায়। যখন এই যুক্তিগুলো

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে প্রযুক্ত হয় তখন অনেক ধর্মীয় দাবিগুলোই তুলনামূলক নিশ্চয়তার সাথে অপ্রমাণ করা সম্ভব। কারণ সেই দাবিগুলো নিজে থেকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এগুলো যুক্তির মুখে এমনিতেই ভেঙ্গে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আব্রাহামীয় ঈশ্বর ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের দ্বারা উপাসিত হন। ধরুন আব্রাহামীয় ঈশ্বর একই সাথে সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বমঙ্গলময়। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা যে জগৎকে দেখছি সেখানে একই সাথে থাকতে পারে না বা কোএক্সিস্ট করতে পারে না। যখন বড় বড় দূর্যোগ ঘটে এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায় তখন ঈশ্বরের পক্ষে একই সাথে সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়াটা অসম্ভব হয়ে যায়।

হয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের এরকম দূর্যোগ আটকানোর কোন ক্ষমতা নেই অথবা এই সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে একেবারেই ভাবনাচিন্তা করেন না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিটি সংজ্ঞাকে অপ্রমাণ করা সম্ভব নাও হতে পারে তবে ঈশ্বরের কিছু কিছু স্ববিরোধী সংজ্ঞাকে অপ্রমাণ করা সম্ভব।

স্পেক্ট্রাম অব থেইস্টিক প্রোবাবিলিটি অথবা আস্তিকীয় সম্ভাবনার বর্ণালী

আমাদের জীবনের অনেক বিষয়ের মতই আস্তিক্যবাদ এবং নাস্তিক্যবাদকে সাদা বা কালো এর মত দৃঢ় চরম-দ্বিমুখিতায় না ফেলে একটি স্পেক্ট্রাম বা বর্ণালীতে ফেলতে

হয় (অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে হয় আস্তিক নয় নাস্তিক এভাবে শ্রেণীবিভক্ত না করে তাকে আস্তিক্যবাস থেকে নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত বর্ণালীর কোন একটি অবস্থানে রাখার কথা বলা হচ্ছে)। রিচার্ড ডকিন্স তার বিখ্যাত বই "দ্য গড ডিল্যুশন"-এ এই স্পেক্ট্রাম অব থেইস্টিক প্রোবাবিলিটি বা আস্তিকীয় সম্ভাবনার বর্ণালী এর ধারণাটি দেন। এখানে আস্তিক্যবাদ থেকে নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত মোট সাতটি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। এমন নয় যে এই সাতটি অবস্থান নিয়েই বর্ণালীটি, বরং বর্ণালীর ধারণায় এই সাতটি অবস্থানের দুটো পাশাপাশি অবস্থানের মধ্যেও কোন অবস্থান থাকতে পারে। কিন্তু এই সাতটি অবস্থান হচ্ছে বর্ণালীটির মধ্যে থাকা সাতটি মাইলফলক যা দিয়ে বর্ণালীর ভিতরের বিভিন্ন অবস্থানকে সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। নিচে এগুলোর সারমর্ম দেয়া হল:

১। সবল আস্তিক্যবাদ (Strong theism): ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত হয়ে জানেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। সি. জি. ইয়াং এর ভাষায়, "আমি বিশ্বাস করি না, আমি জানি"।

২। কার্যত আস্তিক্যবাদ (De facto theism): ব্যক্তি একশভাগ নিশ্চিন্ত নন যে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু মনে করেন তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে ভেবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

৩। দুর্বল আস্তিক্যবাদ (Weak theism): ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০% এর বেশি, কিন্তু খুব একটা বেশি

নয়। ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে থাকেন।

৪। পরিপূর্ণ অজ্ঞেয়বাদ (Pure agnosticism) অথবা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা (Compleat impartiality): ঈশ্বর থাকার সম্ভাবনা ৫০%। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, তার সত্য হবার সম্ভাবনা ও মিথ্যা হবার সম্ভাবনা ব্যক্তির কাছে সমান।

৫। দুর্বল নাস্তিক্যবাদ (Weak atheism): ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০% এর কম, কিন্তু খুব একটা কম নয়। ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নন কিন্তু সন্দেহবাদের (Skepticism) দিকে তিনি ঝুঁকে থাকেন।

৬। কার্যত নাস্তিক্যবাদ (De facto atheism): ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু ০% এর উপরে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক নন কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অনেক কম বলে মনে করেন এবং ঈশ্বর বলে কিছু নেই ভেবেই জীবন অতিবাহিত করেন।

৭। সবল নাস্তিক্যবাদ (Strong atheism): ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা শূন্য। ব্যক্তি শতভাগ নিশ্চিন্ত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

ডকিন্স বলেন, বেশিরভাগ আস্তিক মানুষ তাদের সন্দেহের বিরুদ্ধে গিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তভাবে আকড়ে থাকেন, এবং তাই নিজেদেরকে ১ নং অবস্থানেই ফেলেন। এদিকে

বেশিরভাগ নাস্তিক নিজেদেরকে ৭ নং অবস্থানে ফেলেন না, কারণ প্রমাণের অভাবে নাস্তিক্যবাদের উদ্ভব হয় এবং প্রমাণের উপস্থিতি সবসময়ই চিন্তাশীল মানুষের চিন্তাকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। বিল মার এর নেয়া এক সাক্ষাতকারে ডকিন্স নিজেকে ৬ নং অবস্থানে ফেলেন বলে স্বীকার করেছিলেন। তবে পরবর্তিতে এনথোনি কেনি এর নেয়া এক সাক্ষাতকারে ডকিন্স প্রস্তাব করেন "৬.৯" নং অবস্থানই বেশি শুদ্ধ হবে।

যদি আপনাকে নিজের বিশ্বাসকে ডকিন্সের স্কেলে রেট করতে বলা হয় তাহলে আপনি নিজেকে কোন অবস্থানে ফেলবেন?

স্যাম হ্যারিস তার বই লেটার টু অ্যা ক্রিশ্চিয়ান নেশনে লিখেন:

প্রকৃতপক্ষে, "নাস্তিকতাবাদ" হচ্ছে এমন একটি পদবাচ্য, যার অস্তিত্বই থাকা উচিত না। কেওই নিজেকে "আমি জ্যোতিষ নই" বা "আমি আলকেমিস্ট নই" এই মর্মে অভিহিত করেন না। যেসব ব্যক্তি সন্দেহ করে এলভিস [একজন আমেরিকান সংগীত শিল্পী] এখনো জীবিত থাকতে পারে অথবা এলিয়েনরা হাতের ছোয়ায় এই মহাবিশ্বকে তাদের গোয়ালের প্রাণী বানিয়ে রাখবে, তাদের জন্য শব্দ খরচ করার মত শব্দ আমাদের নেই। যে ধর্মের সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না, এজাতীয় ধর্মের বিপরীতে যুক্তিবাদী ব্যক্তির যে কোনো শব্দই নাস্তিক্যবাদের

প্রতিনিধিত্ব করে। স্বতন্ত্রভাবে নাস্তিক্যবাদ শব্দটির আমদানী অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার মাত্র।"(Harris 2006, পৃ. 51)

বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে শুধুমাত্র "ঈশ্বরে অবিশ্বাস"কেই সাধারণত নাস্তিক্যবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

"প্রাণের জটিলতা দেখে এর সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন ভাবতে সহজ হয় বলেই আমি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু, আমি মনে করি, যখন আমি বুঝতে পারলাম, ডারউইনিজম এই জটিলতার আরো উন্নত ব্যাখ্যা দেয় তখন তা আমাকে সৃষ্টিতত্ত্বের জাল থেকে বেড়িয়ে আসতে সাহায্য করলো।" -রিচার্ড ডকিন্স

নাস্তিকতা মানে এখন কোনো সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমালোচনা নয়, বরং সমস্ত ধর্ম যা আধ্যাত্মিকতা বা অলৌকিকতা নিয়ে কাজ করে বা বিশ্বাস করে, তার বিরোধিতা করা।

পরিশেষে -

শক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাম্

লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।। (ঋঃ ১০|৭১|২)

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতম্ চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্ তন্মে

রাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাত্ সত্যমুপৈমি।।

(য়জুঃ ১|৫)

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোত্সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।

অশ্রদ্ধামনৃতেऽ দধাচ্ছ্রদ্ধাঁসত্যে প্রজাপতিঃ।।

(য়জুঃ ১৯|৭৭)

য়দর্বাচীনম্ ত্রৈহায়ণাদনৃতম্ কিম্ চোদিম।

আপো মা তস্মাত্সর্বস্মাদ্ দুরিতাত্পাত্বম্হসঃ।

(অথর্বঃ ১০|৫|২২)

সুবিজ্ঞানম্ চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী

পস্পৃধাতে। তয়োর্য়ত্সত্যম্

য়তরদৃজীয়স্তদিত্সোমোऽবতি হন্ত্যাসত্।।

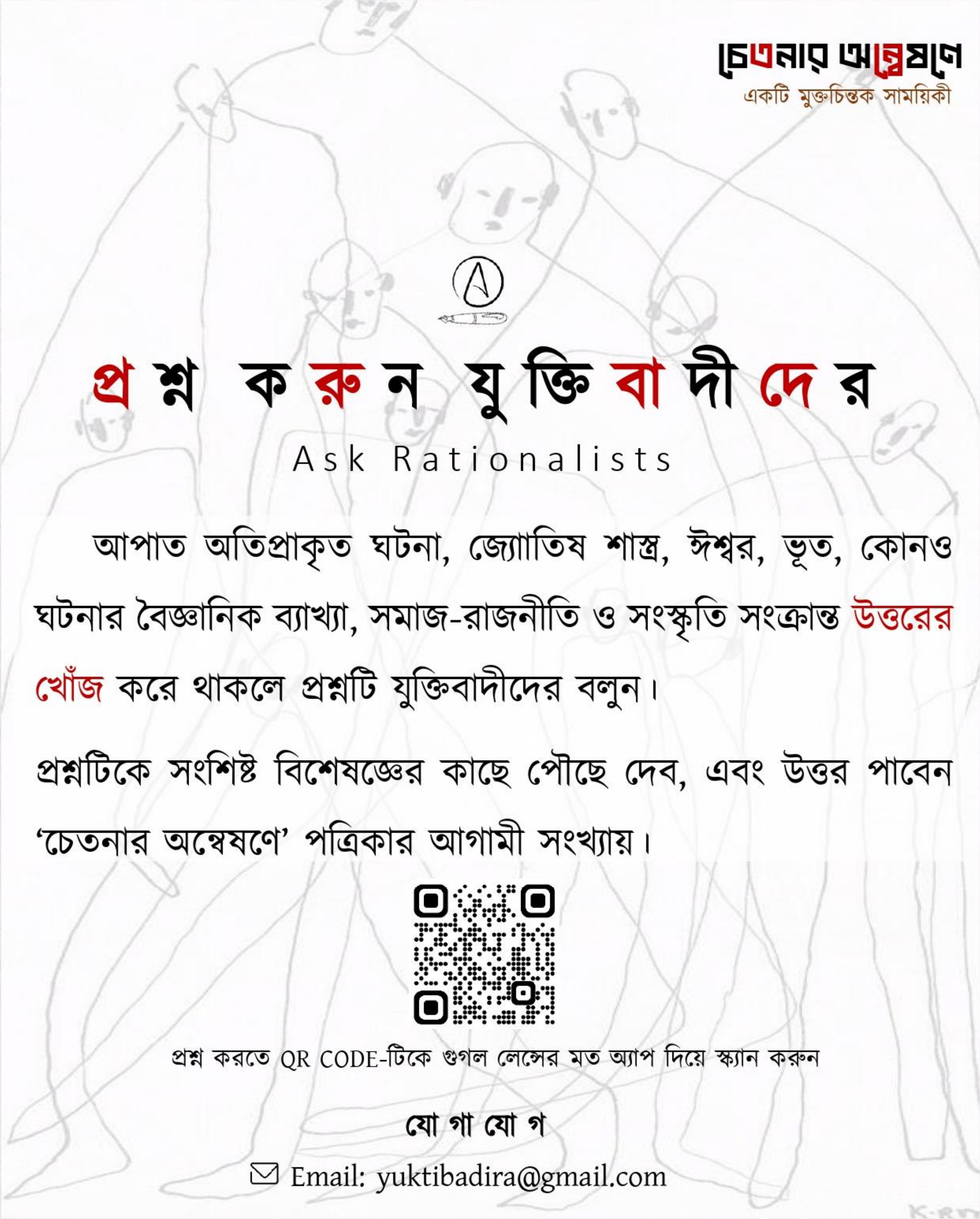
(ঋঃবে: ৭|১০৪|১২)

অর্থাৎ - যেভাবে চালনি দিয়ে ছাতু চালা হয় সেইভাবে যেখানে বিদ্বানগণ নিজের বাণীকে মন দ্বারা শুদ্ধ করে বলেন, সেখানেই লক্ষ্মী আর মিত্রতা বাস করে। হে পরমেশ্বর! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি নিজের শক্তিভর সত্যের পালন করবো, তাই এই অসত্য থেকে বেরিয়ে সত্যতে আসছি। প্রজাপতি সত্য আর অসত্যকে ভেবেচিন্তে আলাদা করেছেন আর অসত্যতে অশ্রদ্ধা তথা সত্যতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করেছেন। তিন বর্ষের এইপারে যে মিথ্যা আমি বলেছি, হে পরমাত্মন্! সেসব দুষ্ফল পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মানুষের সুবিধার জন্য সত্য আর অসত্যের বিজ্ঞানকে একে-অপরের বিরুদ্ধ বলা হয়েছে। এই উভয়ের মধ্যে যা সত্য হবে সেটা সরল আর সোজা স্বভাবে বলা

হয়ে থাকে তথা তাতে কোমলতা আসে, কিন্তু অসত্য হলো সেটা যা সর্বপ্রকারে বিনাশই করে থাকে।

উপনিষদ যারা তৈরি করেছেন তারা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেননি তো; রক্তমাংসের শরীরের ইহলোকে বসে যে ধারণা তাঁদের ভালো লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।

- জীবনানন্দ দাশ



প্রশ্ন করার গুগল ফর্মের লিংক -

https://forms.gle/nrrM8oJdQei79jzR9

ইসলামে বিবাহ ভিত্তিক নারীর প্রটেকশন কি?

লিখেছেন - বেনজির সুলতানা



যদি নারীর স্বামী একাধিক বিয়ে করে তাহলে কি সেটা ক্রিমিনাল অফেন্স ইসলামে? উত্তর হল, না। শরিয়া অনুসারে বহুবিবাহ বৈধ। তাহলে ইসলামের সিভিল ল যদি শরিয়া মতে বিয়ে হয় তবে তো তাকে সেই সব নিয়মকানুন মেনে চলতেই হবে। তাই কোন অ্যাক্ট এ বিয়ে হচ্ছে সেটা জানা খুব জরুরি দরকার। অনুসারে এই ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের কোনো প্রটেকশন নেই।

যদি স্বামী ট্রিপল তালাক, তালাক-এ বিদ্যাত, দিয়ে আবার হালালা করতে বলে, তবে কি নারীর অধিকার প্রটেকশন আছে ইসলামে? উত্তর হল, না।

যদি কোনো নারীর কন্যা সন্তান হয়, এবং ইসলাম স্বামীর পরিবার সেই মেয়েকে 14 বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে সেই মেয়ের কি কোনো আইনি প্রটেকশন আছে? উত্তর হলো, নেই। কারণ ইসলামে puberty হল বিয়ের বয়স, এবং কোনও মেয়ের যদি 13 বছর বয়সে puberty আসে তবে তার বিবাহ 13 বছর বয়সেও আইনত বৈধ। এর অর্থ ১৮ হবার আগেই কোনও অভিভাবক মেয়ের বিয়ে দিলে শরিয়াহ মতে সেটি বৈধ। কোনও শাস্তি নেই।

আরেকটা কথা তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদ হয়েছে ভারতে। যারা মনে করছেন পুরো তালাকটাই তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল। ৩ মাসে তিন তালাকের আইন শরিয়াহ অনুসারে সেটি বহাল আছে।

ইসলামে বিবাহিতা মেয়েদের সিভিল-এ প্রটেকশন নেই। মানুষের চরিত্র বদলাতে দু'দিন লাগে না, তাই ছেলে ভালো না মন্দ বিষয় নয়, আর মানুষ কে চেনাও দায়। কে কখন বদলে যায় বোঝা বড়ো দায়। বিষয় হল যেই ধর্মের ভিত্তিতে সিভিল ল-এ নারীর অধিকার protected আছে সেটা দেখে বিয়ে করায় ভালো।

যদি শরিয়া মতে বিয়ে হয় তবে তো তাকে সেই সব নিয়মকানুন মেনে চলতেই হবে। তাই কোন অ্যাক্ট-এ বিয়ে হচ্ছে সেটা জানা খুব জরুরি দরকার। আরেকটা প্রশ্ন যে মুসলিম মেয়ে শরিয়া অনুসারে বিয়ে না করে স্পেশাল marriage act এ করল। তাহলেই কি সমস্যার সমাধান আছে? সেই দম্পতির যদি কন্যা সন্তান হয় তার ধর্ম কি হবে? অবশ্যই পিতার ধর্ম। যখনই সেই কন্যার ধর্ম পিতার ধর্ম ইসলাম হচ্ছে, সাথে সাথে তার সমস্ত সিভিল অধিকার সমাপ্ত। সেই অধিকার কিভাবে প্রটেক্ট হবে?



মন্দির মসজিদ ভাত যোগাবে?

লিখেছেন – পার্থপ্রতিম পাল



বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ২৮ বছর পেরতে চলেছে। সেই কলঙ্কিত দিনের কথা মনে করে আজও লজ্জা পান রাকেশ কুমার। রাকেশের বয়স তখন ১২। করসেবকদের সঙ্গে জুটে গিয়ে মসজিদের ইট খুলে একটা গম্বুজ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ অবশ্য একবাক্যে স্বীকার করছেন খুবই খারাপ কাজ করেছিলেন তিনি। আজ চল্লিশের দোরগোড়ায় তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মন্দির বা মসজিদ কেউই পেটে ভাত জোগাবে না। যে উন্নয়নের প্রয়োজন অযোধ্যায় তার কিছুই হয়নি। নেতারা ধর্মের রাজনীতি করে চলেছেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

রাকেশ কুমার।

কী ধরনের উন্নয়ন হতে পারে অযোধ্যায় এ নিয়ে প্রশ্ন করলে রাকেশ জানিয়েছেন, ওখানে এখন সিঙ্গল লাইনের রেলপথ। তার ওপর সরাসরি ট্রেন নেই বললেই চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এত খারাপ যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পৌঁছতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যায়। অযোধ্যার মানুষের রোজগারের প্রধান উপায় পর্যটন। যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি না ঘটলে খালি পেটে থাকার অবস্থা হয়ে যায়। রাকেশ বলছেন, মথুরা, বারাণসী বা আগ্রায় পর্যটনে নজর দেওয়া হয়েছে, সেখানে মানুষ আসছেন। অযোধ্যায় ৪০ বছর আগে যা ছিল, এখনও সেই অবস্থা। স্থানীয় মানুষ ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করতেও ভয় পান, কারণ এলাকার পরিস্থিতি কখন বিগড়ে যায় তা কেউ জানে না।

করসেবকদের আস্ফালন।

রাকেশ বলছেন মসজিদ ভাঙতে কোনও অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। মসজিদের এতই জরাজীর্ণ হাল ছিল যে নীচের দিকের সমস্ত ইট হাত দিয়েই খুলে নেওয়া গেছিল। ফলে নীচে ফাঁকা হয়ে গম্বুজ মাটিতে ভেঙে পড়ে। ভিডিও ফুটেজে অবশ্য বড় বড় হাতুড়ি, শাবল ব্যবহার হতে দেখা গেছে। রাকেশ জানিয়েছেন, তেলুগু বা মালয়লাম ভাষার কিছু মানুষও মসজিদ ভাঙার কাজে জড়ো হয়েছিলেন। ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল গোটা এলাকা।

বাহিনী দিয়ে এলাকা ঘেরাও করে মসজিদ ভাঙা আটকানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই কলঙ্কিত অধ্যায় প্রসঙ্গে বিজেপির হয়ে এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর বলেছেন, ‘লজ্জা কীসের, মসজিদ ভাঙা তো আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।’

"আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই, যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না : সত্য দেয়,, যা কেবল ইন্ধন দেয় না,, অগ্নি দেয়”।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানীরা কি জ্বিন বা শয়তানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে?

লি খে ছে ন – প্রি ন্স ফা র্দি না ন্দ



(পর্ব-১)

উত্তর: এই প্রশ্নটা প্রায়ই মুমিনদের কাছ থেকে শোনা যায়। আমি নিজেও অফলাইনে বহু মুমিনের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক করেছি যাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রিধারী। তাই এই প্রশ্নটার একটা বিশ্লেষনমূলক উত্তর লেখার তাগিদ অনুভব করছি। এই লেখাটাতে আমি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও সূত্রসমূহের আলোকে জিনের অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবো। লেখাটাকে দুটি অংশে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। প্রথম অংশে আমরা কোরান, হাদিস ও

তাফসিরসমূহের আলোকে জিনদের পরিচয়, দৈহিক গঠন,খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান সম্পর্কে জানবো এবং দ্বিতীয় অংশে জিনদের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করবো । তাহলে চলুন শুরু করা যাক -

প্রথম অংশঃ

১) জিনদের পরিচয় ও সৃষ্টির ইতিহাসঃ

কোরান, হাদিস ও তাফসির গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে (আদমকে) সৃষ্টি করার আগে জ্বিন নামক একটা জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন যারা আগুনের তৈরি। আদমকে সৃষ্টির বহু আগে তারা পৃথিবীতে বসবাস করতো এবং আল্লাহর ইবাদাত করতো। একসময় তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং রক্তপাত ঘটায়। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তাদের নিকট প্রেরণ করে। তারা সেই জিনদের কতককে হত্যা করে এবং কতককে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে বিভিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দেয় কিন্তু জিনদের প্রধান নেতা ইবলিশকে কয়েকজন ফেরেশতারা বন্দী করে আকাশে নিয়ে যায়। সেখানে সে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করতে করতে নিজেকে এতই উচ্চস্তরে নিয়ে যায় যে, চারডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাদের মধ্যে অধ্যবসায়, জ্ঞান , মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সে সকলের সেরা হয়ে ওঠে । তাকে জান্নাতসমূহের (স্বর্গ) রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিম্ন আকাশ ও পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব

দেওয়া হয়। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু সে নিয়ন্ত্রণ করতো।

তারপর আল্লাহ যখন পৃথিবীতে আদমকে সৃষ্টি করার সংকল্প করলেন এবং মাটি দ্বারা তার দেহাবয়ব তৈরি করলেন তখন জিনদের প্রধান এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী আযাযীল বা ইবলিশ তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। যখন সে দেখতে পেল যে এটি একটি শূন্যগর্ভ, মূর্তি তখন সে আঁচ করতে পারলো যে, এটি এমন একটি দেহাবয়ব যার আত্মসংযম থাকবে না। তখন সে বললো যদি তোমার উপর আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করবো। আর যদি আমার উপর তোমার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে আমি অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা করবো।

তারপর যখন আল্লাহ আদমের মধ্যে তাঁর রুহের (প্রাণ বা আত্মা) সঞ্চার করলেন এবং তাকে সিজদাহ্ করার জন্য ফেরেশতাগনকে আদেশ দিলেন, তখন প্রবল হিংসাবশে ইবলিশ তাঁকে সিজদাহ্ করা থেকে বিরত থাকে এবং বলে, আমি তার চাইতে উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি থেকে। এভাবে ইবলিশ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। সে ভুল যুক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং

তার সমস্ত মর্যাদা যা সে ইবাদত বন্দেগী করে অর্জন করেছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়।

অবশেষে ইবলিশকে উর্ধ্বজগত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে কোনরকম বাস করতে পারে এতটুকু স্থানও তার জন্য হারাম করে দেয়া হয়।

অগত্যা সে অপদস্ত লাঞ্চিত ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় পৃথিবীতে নেমে আসে এবং তার অনুসারী অন্যান্য জিনদেরকে (যাদেরকে শয়তান বলা হয়) নিয়ে আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল পথে ও ঘাঁটিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে ইবলিশের নাম ছিল আযাযীল। আযাযীল ফেরেশতাদের মতই ছিলো বটে। তবে সে ফেরেশতা জাতিভুক্ত ছিল না। কারণ সে হল আগুনের সৃষ্টি আর ফেরেশতারা নূরের (আলোর) তৈরী।

২) জিনদের আকৃতি ও গঠনঃ

কোরান এবং হাদিস অনুসারে,

জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধুম (ধোঁয়া বিহীন) অগ্নিশিখা হতে। তারা মানুষের আকার ধারণ করতে পারে এবং মানুষের মত কথা বলতে পারে ও শুনতে পারে। এরা মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর আকার ধারণ করতে পারে বলে হাদীসে বলা হয়েছে।

৩) জিনদের খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থানঃ

জিনরা আদম সন্তানদের মতই পানাহার, বংশবিস্তার ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর হাড়-হাড্ডিই হলো জিনদের খাবার। এছাড়াও মানুষের ফেলে উচ্ছিষ্ট, শুকনো হাড়, গোবর এসমস্তই জিনদের খাবার।

জিনরা সাধারণত মানুষের বসবাসের স্থানে থাকে না। তারা মানুষের পরিত্যক্ত স্থানে থাকতে পছন্দ করে। তাদের অধিকাংশই মানুষের কাছ থেকে দুরে নির্জন এলাকায় বসবাস করে। তবে কিছু প্রজাতির জ্বীন মানুষের সাথে লোকালয়ে থাকে । এক হাদিস থেকে জানা যায়, জ্বীনেরা নোংরা ও গন্ধময় জায়গায় থাকতে পছন্দ করে, যেখানে মানুষরা ময়লা এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ফেলে রাখে। পায়খানা এবং প্রস্রাব করার জায়গাগুলোতে জ্বীনদের অবাধ বিচরণ।

(২)

এই অংশে আমরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকে দেখানোর চেষ্টা করবো যে, কোরান - হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জ্বিনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নাকি নয়।

পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন থেকে আমরা জানি যে, এই ইউনিভার্স এ যা কিছু আছে তা হয় পদার্থ নয় শক্তি।

আইনস্টাইনের ভর-শক্তির সমীকরণ (E= mc^2) হতে আমরা জানি, পদার্থ ও শক্তি পরস্পর রুপান্তরযোগ্য।

আবার বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কিত ম্যাক্স প্ল্যাংকের সমীকরণ

(E= nhf) থেকে আমরা জানি, শক্তি বা বিকিরণ হল কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেটের সমষ্টি। শক্তির এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা প্যাকেটগুলিকে বলা হয় কোয়ান্টা বা ফোটন। আমাদের এই ইউনিভার্সে বিদ্যমান বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি, ব্ল্যাকহোল, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও অন্যান্য জোতিষ্কসহ যা কিছু আছে তার সবই হল ভর-শক্তি। অর্থাৎ আমাদের এই বস্তুবাদী মহাবিশ্বে ভরশক্তির বাহিরে কিছুই নেই। আমাদের পৃথিবী, এর সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, নদ, নদী, গাছপালা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীসহ যা কিছু আছে তার সবই আসলে ভর-শক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

এবার আসি জিনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। কোরানে বলা হয়েছে যে, জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নি শিখা থেকে এবং হাদিসে বলা হয়েছে নির্ধুম অগ্নি শিখার কথা। তাহলে এবার আমাদের জানতে হবে অগ্নি বা আগুন এবং নির্ধুম অগ্নি বলতে আসলে কি বোঝায়।

সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে বলতে গেলে, আগুন হলো প্লাজমা, যাকে মাঝেমাঝে ‘পদার্থের চতুর্থ দশা’ বা ‘Fourth State of Matter’ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে |

এর কারণ যে কোনো পদার্থের গ্যাসীয় রূপকে যখন যথেষ্ট পরিমানে শক্তি বা তাপমাত্রা প্রদান করা হয়, তখন সে প্লাজমায় রুপান্তরিত হয় | এই অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থটির পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলি মুক্ত হয়ে পড়ে যার ফলে

অবশিষ্ট পরমাণু একটি ‘পজিটিভ চার্জ’ ধারণ করে ও তাকে তখন ‘পজিটিভ আয়ন’ বলা হয়; এই পজিটিভ আয়ন ও ইলেক্ট্রনের সমষ্টিকেই আমরা বলি ‘প্লাজমা’ | উল্লেখ্য, সব আগুনই প্লাজমা না। তাপমাত্রা এবং পদার্থটি কতটা আয়নাইজড হয়েছে সেটার ওপর নির্ভর করে তাকে প্লাজমা বলা যাবে নাকি না।তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নীচে হলে তাকে প্লাজমা বলা যায় না।

অন্যভাবে বলতে গেলে, আগুন হল একটি রাসায়ণিক বিক্রিয়া,যাকে দহন বিক্রিয়া বলা হয় । এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic Reaction)। অর্থাৎ এই বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। দাহ্যবস্তু, অক্সিজেন বা অন্য কোন জারক পদার্থ ও তাপ এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে যে বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সাধারনতঃ তাকেই আগুন বলে। যে কোন একটি উপাদানের কমতি থাকলে আগুনের সৃষ্টি কখনোই হবেনা।

এই দহন বিক্রিয়া (Combustion Reaction) আবার দুই ধরনের হয়। যথা-

১) Complete Combustion এবং

২) Incomplete Combustion

যখন কোনো জ্বালানি পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ পায় তখন যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় complete combustion বা পূর্ণ দহন। এই Complete Combustion এর সময় যে শিখার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় নির্ধুম অগ্নিশিখা বা ধোঁয়াহীন আগুন। কারণ এক্ষেত্রে কোন ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না। গ্যাসবার্নারে ও মোমবাতির শিখার গোড়ায় এ ধরনের আগুন তৈরি হয়।

আবার, পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কিংবা যথেষ্ট পরিমাণ তাপ না পেলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাকে Incomplete Combustion বা অপূর্ণ দহন বলে। Incomplete Combustion-এ কার্বন মনোক্সাইড ও অন্যান্য জটিল যৌগ উৎপন্ন হয়, এগুলো এবং অবশিষ্ট হাইড্রোকার্বনগুলো ধোঁয়া হিসেবে পরিচিত। মোমবাতির শিখার উপরের অংশে, কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, কাঠ ইত্যাদিতে এই ধরনের আগুন তৈরি হয়।

যাইহোক আবার ফিরে আসি মূল আলোচনায়। এতোক্ষনে আমরা জেনে গেছি যে, আগুন আসলে একধরনের গ্যাসমিশ্রণের বিক্রিয়াকালীন অবস্থা যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা তাপ প্রদানের ফলে সংগঠিত হয় এবং বিক্রিয়ার ফলে সেখান থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই আগুনকেও আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে ভর-শক্তি বলতে পারি।

সুতরাং কোন কিছু যদি আগুনের তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে ম্যাক্স প্লাংকের সমীকরণ অনুযায়ী সেটার একটা ফ্রিকোয়েন্সী থাকবে, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ থাকবে, সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটা রেঞ্জ বা সীমা থাকবে।

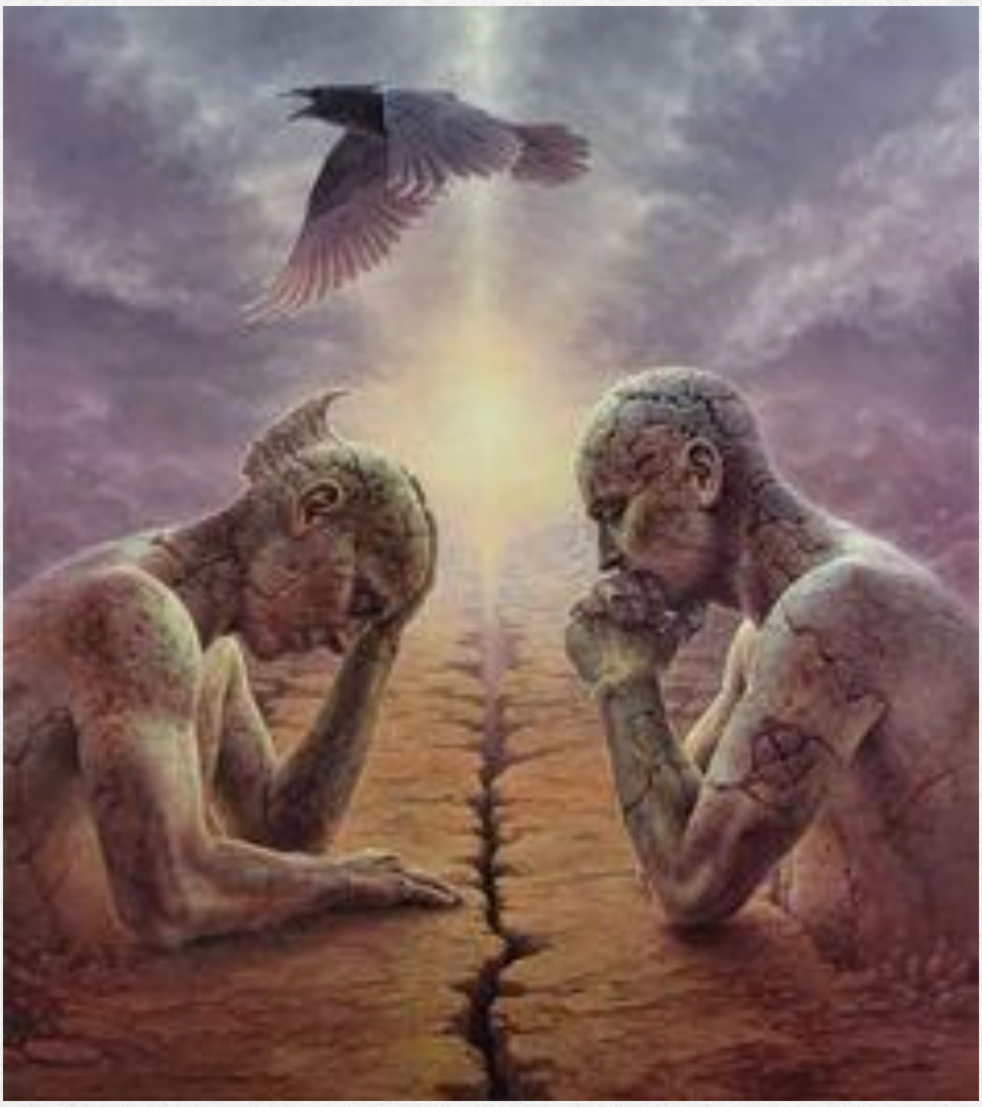
যেমনঃ দৃশ্যমান, অবলোহিত , তড়িচ্চুম্বকীয়, অতিবেগুনী, মাইক্রোওয়েব ইত্যাদি বিকিরণের প্রতিটির ক্ষেত্রে তাদের আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি রয়েছে। কেবল দৃশ্যমান আলো তথা বিকিরণ (বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুধ, কমলা লাল) বাধে অন্যান্য বিকিরণ সমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না।

তবে যতো ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা দুর্বল শক্তির বিকিরণই হোক না কেন আধুনিক উন্নত সেন্সর মেশিন ও ডিটেক্টর গুলোতে বিজ্ঞানীরা সেটা অবশ্যই ধরতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ অবধি বিজ্ঞানীরা জিন/ভূত /প্রেতাত্মা নামক অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। আসল কথা হল জিন,ভূত, প্রেতাত্মাদের মতো অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছু নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন না।

বিভিন্ন ভুতুড়ে স্থানে ডিটেক্টর মেশিন গুলোতে যেসব রেডিয়েশন ধরা পরে সেগুলোকে অনেকে জিন ভুতের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে চালানোর চেষ্টা করে। অথচ তাড়া জানেই না যে, ডিটেক্টরে ধরা পরা বিকিরণ গুলো আমাদের খুবই পরিচিত ও স্বাভাবিক।

এই যেমন, ধরেন আপনি ভুতুড়ে স্থান নামে পরিচিত কোন এক প্রকান্ড ঝোপঝাড়ের নিকট গিয়ে যদি একটি ইলেকট্রনিক ফিল্ড ডিটেক্টর বা EMF মিটার স্থাপন করেন তাহলে দেখবেন সেখানে যন্ত্রটি অনেক সিগনাল দিচ্ছে। কিন্তু এই সিগনালগুলোকে যদি কেউ ভূত-প্রেত বা জিনের অস্তিত্ব বলে দাবি তাহলে এরচেয়ে বড় মুর্খতা আর হয় না।



কারণ এই যন্ত্রটি বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন বিভিন্ন ধরনের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ শনাক্ত করার জন্য। আপনার পরিক্ষনীয় স্থানের আশেপাশে বিভিন্ন উৎস থেকে (যেমনঃ বজ্রপাত বা পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট চার্জসমূহ, এক্স-রে, টিভি অ্যান্টেনা, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, পাওয়ার লাইন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

ইত্যাদি) এই তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে যা আপনার সেট করা সেন্সর বা ডিটেক্টরে ধরা পরে। নীচে আপনাদের জানার সুবিধার্থে কয়েকটি ডিটেক্টরের নাম উল্লেখ করলাম। এই যন্ত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আপনারা গোগলে খুঁজুন।

১) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টর বা EMF মিটার

২) ইলেকট্রনিক ভয়েস ফেনোমেনা বা EVP

৩) এক্সটার্নাল থারমোমিটার

৪) ডিজিটাল ইনফ্রারেড ক্যামেরা

৫) আল্ট্রাভায়োলেট লাইট ইত্যাদি।

আবার ফিরে আসি জিন প্রসঙ্গে। হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে,জিনেরা মানুষের মতো পানাহার, যোনক্রিয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে পার এবং তাদের শ্রবণশক্তি আছে। তারা মানুষের ফেলে দেয়া হাড়-হাড্ডি খেয়ে বেঁচে থাকে। তাহলে মুমিন ভাই বোন ও ইসলামিক স্কলারদের নিকট আমার কয়েকটি প্রশ্ন।

১) জিনদের ও কি মানুষের মতো পরিপাকতন্ত্র আছে ? না থাকলে তারা হাড়-হাড্ডি খেয়ে হজম করে কিভাবে?

২) জিনদের কি শ্রবণঅঙ্গ আছে? না থাকলে তারা শ্রবণ করে কিভাবে ?

৩) বলা হয়েছে জিনদের প্রকৃত আকৃতি মানবচোখে অবলোকনযোগ্য, তাহলে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না কেন?

৪) জিনদের কি আমাদের মতো জনন অঙ্গ আছে? না থাকলে তারা যোন কর্ম ও বংশবিস্তার করে কিভাবে ?

৫) বলা হয়েছে জিনরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ও নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটায়। জিনদের দেহ তো আমাদের মতো

রক্তমাংস দিয়ে তৈরি না, তাহলে তারা রক্তপাত ঘটায় কি করে?

৬) পৃথিবীতে আদমকে পাঠানোর আগে জিনদের খাবার কি ছিলো ? তখন তো আর আমরা হাড়-হাড্ডি, উচ্ছিস্ট, গোবড় এসব ফেলে রাখতাম না।

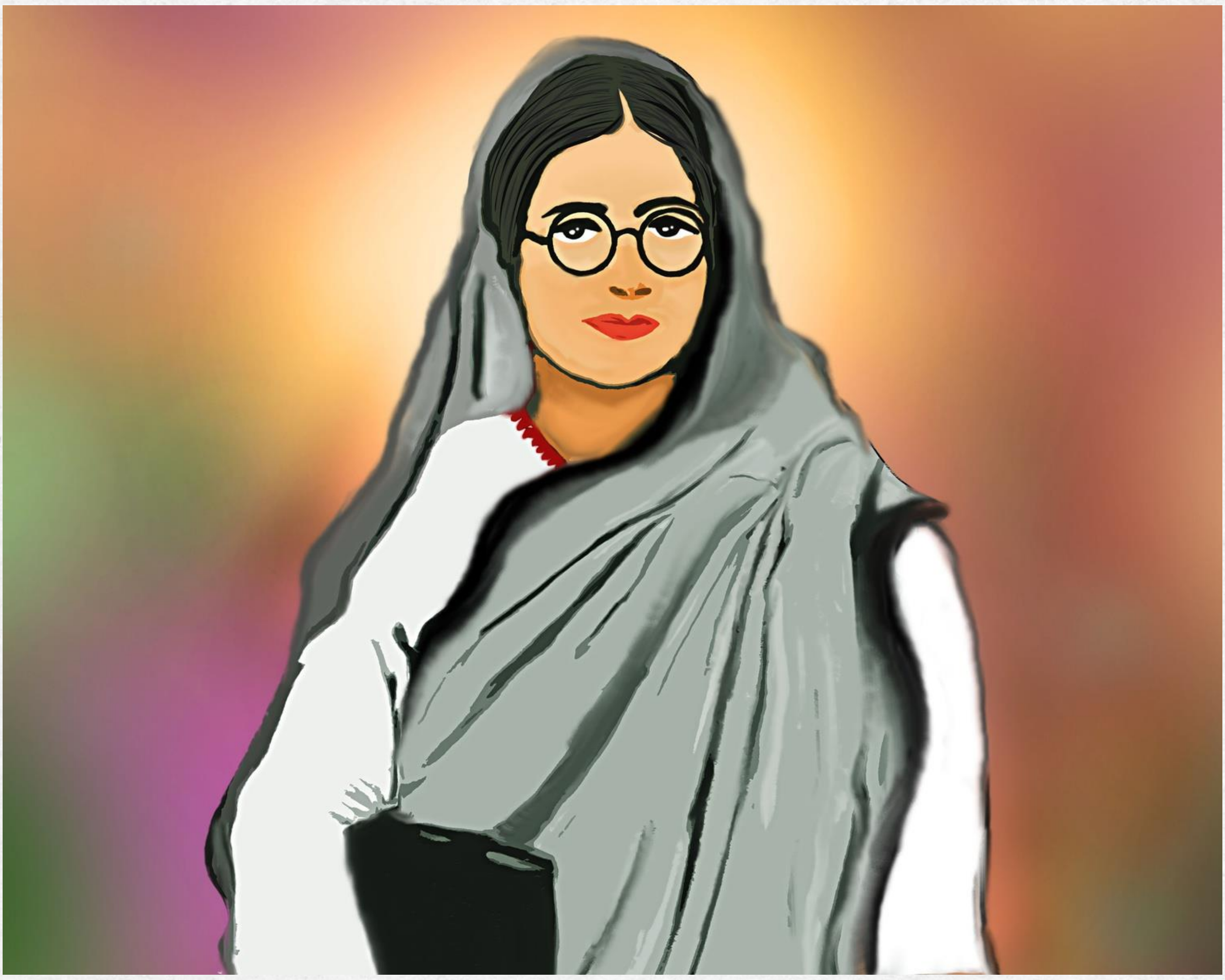
৭) আমরা জানি আলো একধরনের শক্তি, আবার আগুনও একধরনের শক্তি। আগুন জ্বালানোর সময় তাপ ও আলো পাওয়া যায়। আবার আলোর সাহায্যেও আগুন ধরানো যায়। অর্থাৎ দুটোই একই জিনিস। তাহলে "ফেরেশতারা আলোর তৈরী এবং জিনেরা আগুনের তৈরি " এই কথার কোন বিশেষত্ব থাকলো?

আশা করি এর একটি গ্রহনযোগ্য উত্তর আপনারা আমাকে দিবেন।

সূচিপত্র

মুক্তমনার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া

লি খে ছে ন – ফ ড়িং ক্যা মে লি য়া



ধর্মের দোহাই দিয়ে, বাঙালী নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শারীরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার যে ষড়যন্ত্র বহুযুগ ধরে চলে আসছিল এর মুল উৎপাটনে পথে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা অস্বীকার্য। ১৯০৪ সালে ২৪ বছর বয়সী রোকেয়া দৃঢ় ভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। তার মত মেধাবী, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মননশীল,সাহসী নারী বাঙালী সমাজে আজও বিরল।

তার সাহিত্য যেমন কালজয়ী তেমন তার প্রখর চিন্তাশক্তি, যুক্তি-বোধ অনেক পুরাতন কুসংস্কার ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল।

তাকে মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত করার হলেও এটা তার কাজের সামান্য একটা পরিচয় মাত্র।

শুধু মুসলিম সমাজ নয়, তিনি সমগ্র বাঙালী সমাজে নারী কে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন।ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে তিনি নারী কে তারস্ব-মহিমায় প্রজ্বলিত হবার শক্তি যুগিয়েছেন।

তিনি তাঁর "আমাদের অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,

যখনি কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছে, তখনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমরা প্রথমত যাহা সহজে মানি নাই তাঁহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনি আপনাকে দেবতা কিংবা

ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।||। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে সেরূপ পয়গম্বর দিগকে(অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়া দিগকে) এবং দেবতা দিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!!

তবেই দেখিতেছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলো পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেহ বলিতে পারেন তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন? তদুত্তরে বলিতে হইবে, 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই ধর্ম লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম”

(রোকেয়া, আব্দুল কাদির, ১৯৭৩, ১১-১৩)

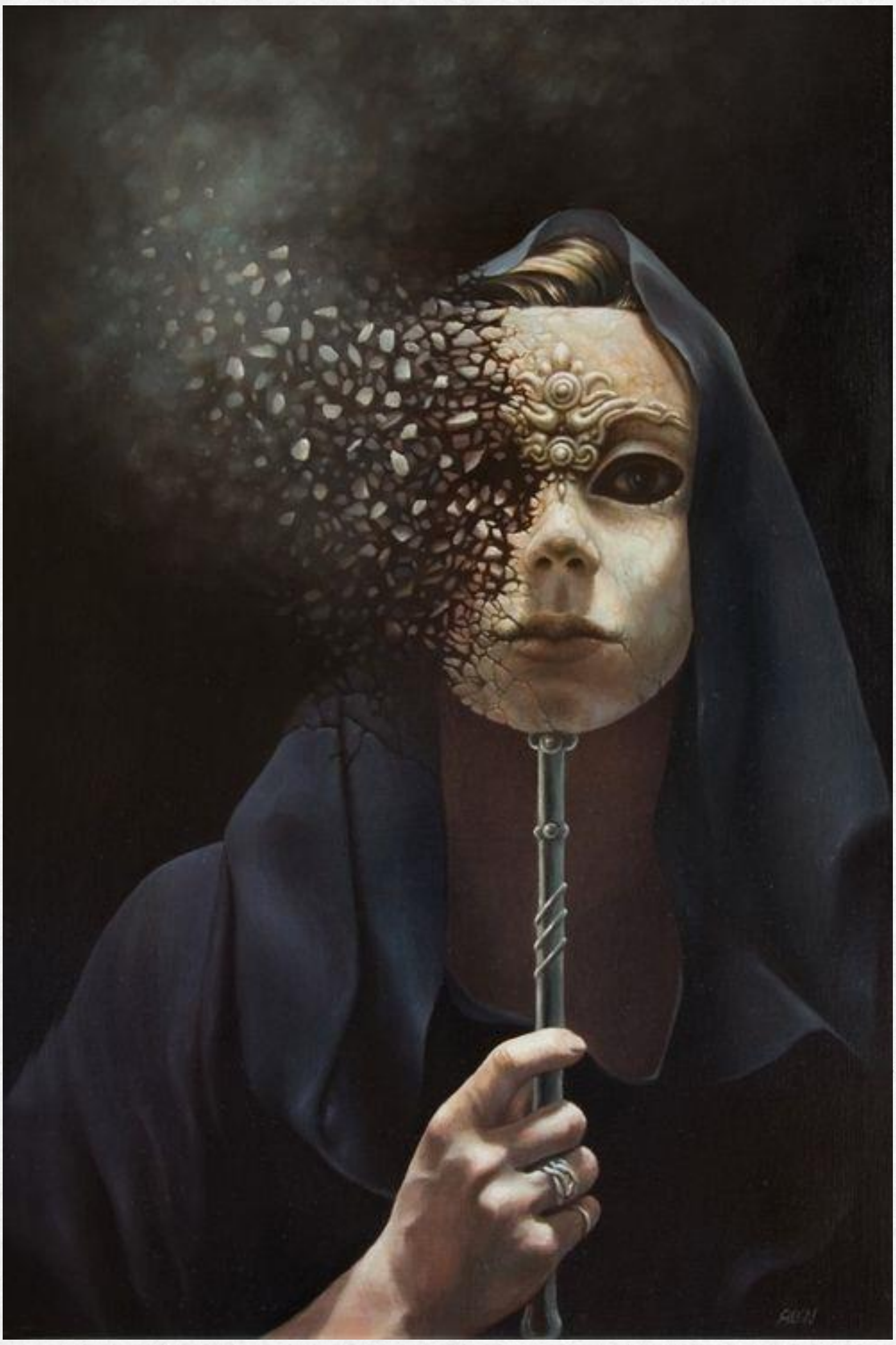
রোকেয়া তার লেখায় সকল কথিত ঈশ্বর প্রদত্ত দূতদের ভণ্ড এবং চতুর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বর এবং ধর্মগ্রন্থগুলো যে তাদের চতুরতার কৌশল মাত্র,রোকেয়া স্পষ্ট ভাষায় তার-ই ব্যাখ্যা করেছেন।যদিও সামাজিক চাপের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি প্রবন্ধ থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল কিন্তু এর গুরুত্ব আজও এই সমাজে প্রবলভাবেই বিদ্যমান।

ঐতিহাসিকগনের মতে, রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা হচ্ছে জ্ঞানফল। গল্প আকারে রোকেয়া লিখেছেন,

ফল ভক্ষণ করিবা মাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল নিজের নগ্নতা সম্পর্কে উপলব্ধি হল। চুল দিয়ে শরীর ঢাকলেন। মানবিক আত্ম উপলব্ধি হতে থাকল। অজানা মর্ম বেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হইল

এরপর আদম নিজে পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল খেলেন। খাওয়ার পর তারও জ্ঞানোদয় হল- তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন। এই কি সর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন, অলস জীবন- ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন তিনি রাজ বন্ধী, এই ইডেন-কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।... এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও শান্তির দেখা দিল। মোহ, কর্মহীনতার অনন্তসুখ থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক সৃষ্টিশীলতার যাতনা নিয়ে আদম হাওয়া যখন কোন এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন তখন // পরমেশ্বর উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দুর হ! পৃথিবীতে গিয়ে দেখ স্বাধীনতার কত সুখ!

তারপরই কনক দ্বীপে অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁহারা, অভাব, স্বাচ্ছন্দ, শোক-হর্ষ-রোগ্য-আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো আধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্য জীবন লাভ করিলেন।



ধর্মগ্রন্থে নারী কে বলা হয়েছে পাপাচারে প্রলুব্ধকারিণী, অথচ রোকেয়া স্পষ্ট দেখিয়েছেন নারী এখানে পুরুষ কে আত্মসচেতন করেছে।পুরুষের ভেতরের মানবিক গুণাবলী কে জাগ্রত করেছে।তাকে জ্ঞান চিন্তায় প্রজ্ঞায় সক্রিয় করেছে। নারী এখানে শক্তিমতী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

তিনি গল্পের ছলে আরও একটি চমৎকার সত্যি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন,

দুইশত বছর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞান ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে, কালক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। ফলে নারীর কোমল হস্তের সেবা যত্ন বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। নারীর আনিত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ কথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে

(রোকেয়া, আব্দুল কাদির ১৯৭৩, ১৮০-১৮৮)

স্বামী শব্দ যে প্রভু ধারণারই প্রকাশ মাত্র বেগম রোকেয়া তা ঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তার ‘স্ত্রীজাতীর অবনতি শীর্ষক’ প্রবন্ধে লিখেছেন,

স্বামী শাব্দের অর্থ কি? দানকর্তা কে দাতা বলিলে যেমন গৃহকর্তা কে গ্রহীতা বলিতেই হয়, সেইরূপ একজন কে স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর বলিলে অপর কে দাসী না বলিয়া রা কি বলিতে পারেন?

তার এধরনের সাহসী সৎ লেখার জন্য মৌলবাদীরা তার বিরুদ্ধে বারবার ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে দমাতে চেয়েছে তাই তিনি লিখেছিলেন,

আমি কারাসিয়াং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি,উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগর তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের পঁচিশ বছর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইয়াছি

পর্দা প্রথা,কোরআন শিক্ষা নিয়ে রোকেয়ার বক্তব্য পড়ে অনেক ক্ষেত্রে মনে হতেই পারে সে একজন গোরা মুসলিম কিন্তু এক্ষেত্রে বোঝা জরুরী তার সামাজিক অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তার মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক ছিলনা কিন্তু তার অবস্থান থেকে ধর্মীয়গুরুদের এবং ধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে তার কঠোর বক্তব্যগুলো তাকে কখনোই একজন ধর্মান্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে না।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরী, রোকেয়া বিষয়ে আকিমুন রহমান তার বিবি থেকে বেগম গ্রন্থে, বেগম রোকেয়া কে স্বামীর অনুকরণকারি হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তার যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হলেও তখনকার রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে তুলনা করলে আজকের সমাজের নারীদের চেয়ে তার চিন্তা অনেকাংশে অগ্রসর ছিল।তিনি রীতি মেনেছেন সামাজিক

কারণেই।তাকে সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় অনেক কৌশলী হতে হয়েছিল।

বেগম রোকেয়া কে নিয়ে এ বিষয়ে আনু মুহাম্মাদ এর চমৎকার একটি লেখা আছে।

এর দুটা লাইন এমন,

রোকেয়ার অগ্রসর চিন্তা ধারণ করতে না পেরে সমাজ তার কম গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় কেই গ্রহণ করেছে- মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত। আর সেই কাজেও রোকেয়া সেই সময় সহযোগিতা পান নি।

কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি লড়েছেন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। তিনি ধর্মের পশ্চাদপদ নিয়ম নীতি কে অস্বীকার করেছেন। রোকেয়ার অগ্রসর চিন্তা সমাজ মেনে নেয়নি বলে তাকে নিঃসঙ্গই থাকতে হয়েছে। তবুও তিনি তার চিন্তার প্রকাশ থেকে পিছু হটেননি। আজকের সমাজ তাকে মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত খেতাব দিয়ে তাদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করলেও সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া একজন মুক্তমনা মানুষ।

মুক্তমনা ব্লগ।

সূচিপত্র

ছোটগল্প:

জব্দ

লিখেছেন – দিবাকর মন্ডল



আমাদের পাড়ায় একদিন দুই সাধুবাবা এসেছিলেন। আমাদের ক্লাবের সামনে বড়ো মাঠ এবং মাঠের পাশে একটি বটগাছ রয়েছে। বট গাছটির চারিদিকে গোল করে বসার জায়গা করা রয়েছে। দুই সাধুবাবা সেখানে বসলেন এবং তাদের দেখার জন্য রীতিমতো জনগণের ভিড় বাড়তে লাগল। সাধু বাবাদের তুষ্ট করার জন্য অনেকেই অনেক রকম উপঢৌকন নিয়ে এলেন। কেউ দিলেন চাল, কেউ ডাল কেউ আলু তো কেউ আবার দুই দশ টাকা। অনেক রকম সবজি এবং ফলও দিয়েছেন। পাড়ার মোড়ল বড়ই ধার্মিক তিনি তো সবার ঊর্ধ্বে। তিনি নিয়ে এলেন একটা

দামি গিনির আংটি। এবার এই আংটি নিয়ে দুই সাধুবাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মোড়ল তো একটি মাত্র আংটি দিলেন কিন্তু ছিলেন দু'জন সাধু, কে নেবে এই আংটি? তারপর একে একে সমস্ত গ্রামবাসীরা বাড়ির ফিরে গেলেন। প্রত্যেকেই আশীর্বাদ পেয়েছেন, শান্তি জল পেয়েছেন। তাই তারা সাধু বাবাদের ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

এতক্ষণ নরেনদা সবকিছু চুপচাপ দেখছিলেন, সবাই চলে গেলেও নরেনদা কিন্তু শান্তভাবে সাধুবাবুদের মাঝে গেলেন এবং তাদের সাথে মিশে গেলেন। এটা সেটা বলতে বলতে নরেনদা একটা যুক্তি দিলেন দুই সাধুবাবাকে। যে সাধুবাবা প্রমাণ করতে পারবেন তিনি সব থেকে বড় ধার্মিক এবং ভগবানের কাছ থেকে দেখা পেয়েছেন তিনি এই আংটির অধিকারী হবেন।

নরেনদার এই প্রস্তাবে দুই সাধুবাবা রাজি হলেন এবং তারা বললেন যে আমরা পাঁচ মিনিট করে তপস্যা করব তারপরে আমরা আমাদের ভগবানের কে কতটা কাছে আসতে পেরেছি তার গল্প শোনাবো। তারপরে নরেনদা বিচার করবে কে সবচেয়ে বড় ধার্মিক। নরেনদা এক কথায় বললেন, “হ্যাঁ ঠিক আছে তাই হোক।”

এভাবে দুই সাধু বাবা যখন পাঁচ মিনিট ধরে ধ্যানে বসলেন সেই সুযোগে নরেনদা সোনার গিনি আংটিটা টুক করে সরিয়ে নিয়ে, কিছু ছাই ভস্ম ঐ স্থানে রেখে দিলেন।

প্রথম সাধু বললেন, "আমি ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কৈলাসে গিয়েছিলাম সেখানে দেখলাম নন্দী ফিরিঙ্গি মহাদেবের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আমি নন্দী ভিরিঙ্গীর সাথে কথা বলে সিদ্ধি খেয়ে তবেই এসেছি। ওরা বলল আমার মত ভক্ত যে ওখানে আসবে তা ওরা জানত।" প্রথম সাধু ভাবলেন মহাদেবের এত কাছ থেকে ঘুরে এসেছি আশা করি আমার থেকে বড় ধার্মিকের গুল গপ্পো দ্বিতীয় আর কেউ শোনাতে পারবে না।

এই গল্প শোনার পর দ্বিতীয় সাধু বলল, "আমিও তো কৈলাসে গিয়েছিলাম আমি গিয়ে মা পার্বতীর সাথে দেখা করে এসেছি, কথা বলে এসেছি, আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম উনি বললেন বাবা বাইরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছেন। মা আমাকে যত্ন করেছেন, বলেছেন আমার মতো ভক্ত পেয়ে মহাদেব ধন্য।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ভাবলো আমি তো মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর সাথে দেখা করেছি তার মনে আমার গল্প হিসাবে আমি প্রথম সন্ন্যাসীর থেকেও বড় ধার্মিক।

এবার বিচারের জন্য তারা দুজনেই নরেনদার মুখের দিকে তাকালো। নরেনদা দুঃখ ভরা মুখ নিয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমরা যে সময় কৈলাসে গিয়েছিলে, তখন তো মহাদেব এখানে এসেছিলেন। বললেন এরা দুজনেই আমার পরম ভক্ত। একটা আংটির জন্যে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগুক তা আমি চাই না, তাই আমি এই আংটি ভস্ম করে দিলাম।” আর আমাকে বললেন, আমি যেন এই ছাই ভস্মটি তার দুই পরম ভক্তের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাই।

এই বলে নরেনদা ছাই-ভস্মটি দুই সাধুবাবাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। আর দুই সাধু তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন!

সূচিপত্র

পাপীর কান্না

লিখেছেন – অশোক দাস চার্বাক



পাপীসব করে রব
রাতি পোহাইল,
নরকের ভয়ে মরি
দেবীকে ডাকিল।

মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা
উঠিল বাজিয়া,

জোটে যত পাপীগণ
ছুটিয়া ছুটিয়া।

কীর্তন করিয়া ওরা
নাচিতে লাগিল,
দেবনামে ধরাধাম
বিষিয়া উঠিল।

যার পাপ বেশী যত,
বেশি যার লোভ পরিমাণ,
গলা ফাটে তার তত
তেজী নেচে যায় যে পরান।

নরকের ভয়ে মরে
যত ভক্তগণ,
করে তাই ইষ্টনাম
করিয়া যতন।

স্বরগের লালসায়
দেবে ফুল ছুঁড়ি,
দান ধ্যান করে তারা
পাপে ভরা ভুঁড়ি।

শত টাকা চুরি করি

দুই টাকা দান,
ভক্ত ভাবে হলো বুঝি
পাপ সমাধান।

কানদিতে লাগিল যত
ভীত সাধুগণ,
"নরকে নিও না মোরে
স্বর্গ দাও পণ। "

এটা দাও ওটা দাও
(এট্যাং দেহি ওটাং দেহি)
গাহি লোভীগন,
দেবতার চরণেতে
কান্দে অনুখন।

দেবতা বলেন,"ওরে
পাপী বাছাধন,
উৎকোচ পাইয়া পাপ
না করি খণ্ডন।"

আমি নেতা আমলা নই
ভাংগিব নিয়ম,
পূজা পেয়ে দিব বর
ত্যেজিয়া ধরম।

প্রকৃতির নিয়মেতে
পৃথিবীটা ঘোরে,
কোন ভগবান সেটা
থামাতে না পারে।

ঘুষ দিয়া দেবগনে
কেনা নাহি যায়,
বৃথা দাও অঞ্জলী
ভুলি নিজ দায়।

নিয়মের দাস আমি
বড় অসহায়,
স্বরগে আনিতে নারি
চাতুরী সহায়।

যে যার কর্মের ফল
সবে ভোগ কর,
বৃথা পূজা চাটুকারী
ঘুষদান ছাড়।

কর্মমত পাওনা সব
নিয়মেতে পাও,
প্রাপ্যবেশী লভিবেনা

যত পূজা দাও। "

গাহিল চার্বাক ঋষি
শুন মন দিয়া,
ধান্দা ধর্ম ছাড়ি দাও
মানবধর্ম নিয়া।

রচনা কাল ২০০১ বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরে ভোরের নাচ কীর্তন দেখতে দেখতে।

সমালোচনা সম্পাদক / asokdas.godless@gmail.com

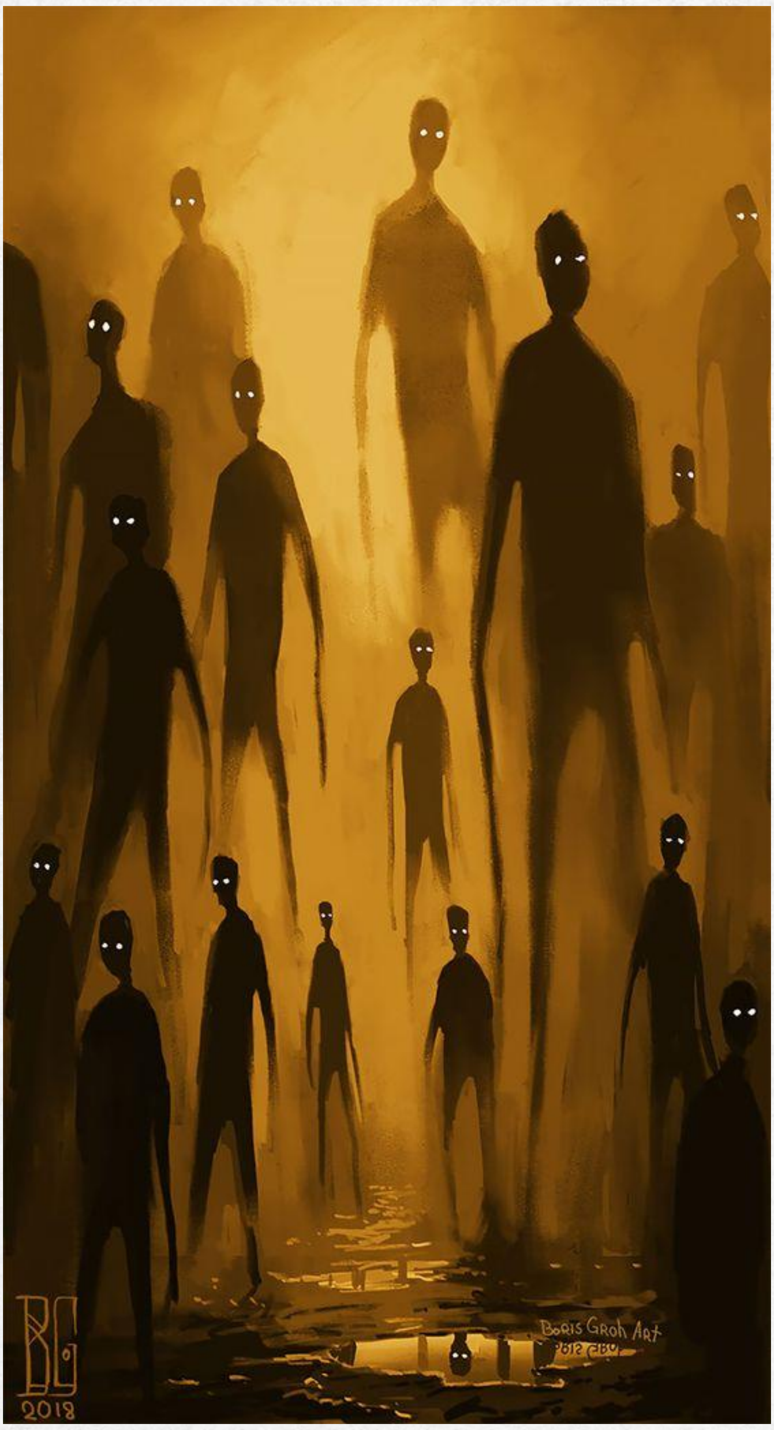
বিশ্বাস যদি করতে হয় তো নিজের উপর করো। ভগবানের ভরসায় তো হাজারো বছর গোলাম ছিলে।।

- ডঃ ভীম রাও আম্বেদকর

সূচিপত্র

মিসাইল

লি খে ছে ন – সা ম্য



সন্ধ্যা নামার পরে,
কলকাতা শহরে,
পার্কস্ট্রিট উড়ালপুলের নীচে,
কাপড় বিছিয়ে,
ঘোড়ার গু আর মানুষের পেচ্ছাপের পাশে শুয়ে,
অন্ধকারে ভয় পেয়ে,
নাঙ্গা শিশু বড় রাস্তার দিকে ছুটে যায়।

তখনই হঠাৎ প্রায়,
আকাশেতে আলো জ্বেলে,
তুচ্ছ বিষয় দূরে ঠেলে,
ঔষধ চাইল ডাইল -
উড়ে যায় মিসাইল।

অবরোধ হবে আজ,
মানুষের নাই কাজ!
কোথায় এ শীতের বেলা -
নন্দন বইমেলা -
নতুন প্রেমিক আশ,
কবিতা লেখার প্রয়াস,
এর মাঝে যত সব,
"কাজ চাই" তোলে রব!
চাই নিরিবিলি ঘর,
নিয়ন আলোর স্বর।
আলো জ্বালে মহানীল,
নিউক্লিয়ার মিসাইল।

দুর্নীতি শিখরে,
পথ জুড়ে ভুখা রে,
তোদের জন্যে আজ
সেজেছি যুদ্ধ সাজ!
ভোট ভোট ভারী মজা,

মরে শুধু কিছু প্রজা।
বিধানসভার বিপরীতে,
জনগণকমিটিতে
জড়ো হয় এই বেলা,
বেস্পতি বারবেলা
কোন ভূতে মারে ঢিল?
কাহাদের মিসাইল?

সূচিপত্র

দুঃসময়

লি খে ছে ন – স জ ল কা ন্তি টি কা দা র



মায়ের চোখে জল কেন আজ
জানিস কি কেউ তোরা?
চারদিকেতে গোলা বারুদ
চলছে ছুরি ছোরা!
স্বাধীনতার এই বকলমে
স্বেচ্ছাচারই চলছে
নেতারা সব কালো টাকায়
গাড়ী বাড়ী করছে!
ছোট্ট শিশু দুধের শিশু
ফুট পাতেতে ঘুরছে
দাদারা সব তাদের বাড়ী
টাইলস দিয়েই মুড়ছে।

ধর্ম নিয়ে চিৎকার শুধু
ধর্ম কোথায় আছে!
চারদিকেতে আঁধার দ্যাখো
ধর্ম পিশাচ নাচে--
উন্মত্ত আজ তোমার ছেলে
উদ্ধত পতাকা নিয়ে
মানুষ মেরে হাত যে রাঙায়
ধর্ম দোহাই দিয়ে!!

পুলিশকে আজ সততার কথা
বলতে মুখে বাধে
খেলার পুতুল তারা যে সব
দেশ নেতাদের হাতে।
মাকে আজ বোকা বানিয়ে
শিশু চুরি হচ্ছে
নেতারা সব মঞ্চে উঠে
মিথ্যে ভাষণ বলছে!

মনুষ্যত্ব আজ কোথায় গেলো
দ্যাখোতো কেউ খুঁজে
আইনও তো দেখছি আজ
আছে সে চোখ বুজে।

এদলকে ওদলেরা যদি
মাখায় কালি চুন
এদলও কম যায় না
বলে যে শতগুন
আসলে রাজনীতি হয়েছে
আজ সার্কাসেরই অঙ্গ
দেখে শুনে লাগছে ব্যথা
তাই কাঁদছে পশ্চিম বঙ্গ।

সূচিপত্র

পৈতা টিকির ছদ্মবেশ

লি খে ছে ন - অ শো ক দা স চা র্বা ক



[নাতির উপনয়ন উপলক্ষে কবিগুরুর "এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন" এবং বিদ্রোহী কবির "জাতের নাম বজ্জাতি সব। ..." ভাবনাদ্বয়কে আশ্রয় করে পাঠকগণকে একটি ছন্দহীন কবিতা নিবেদনের প্রচেষ্টা]

নিজেকে তুঙ্গে তুলি
জনমের উৎস ভুলি
বামুন হইবে তুমি আজ,
পরিয়া পৈতা টিকি
জনচোখে দিবে ফাঁকি
ধরিবেক পুরুতের সাজ।
প্রতারনা করি তুমি
হইবে শূদ্রের স্বামী
শুষিবেক যত যজমান,
নরকের ভয়ে তারা

স্বরগের লোভে ওরা
করিবেক সিধা সোনা দান।
পরজীবী ব্রাহ্মণ
লুটিবে শূদ্রধন
ধর্মের ছুরিতে দিয়া সান,
মনুগপ্পো ফাঁদি তারা
করি সবে দিশাহারা
সাজিবেক যেন ভগবান।
হবে নাকি ব্রহ্মচারী,
শুনিয়া হাসিয়া মরি
ভিক্ষান্নে রাখিবেক দেহ!
দেখি তব মতিগতি
ছলনায় ভরা অতি,
সত্য বলি মানিবেনা কেহ।
পদধূলি চাটি তব
পূন্যি করে বৃদ্ধ নব
সৌভাগ্য হইবে তার অতি,
ছলনায় ভুলি সবে
তোমারে পুজিবে এবে
কৃতার্থ হইবে নিচু জাতি।
করিয়া পুতুল কেলি
মানুষেরে পায়ে ঠেলি
দেখাইবে পূজা অভিনয়,
শুনি নিজ বংশকথা

লাজে পাও বড় ব্যাথা
স্বীকার করিতে করো ভয়।
আফ্রিকার হনুমানী
সবারই ঠাকুমা জানি
ইহা তব জন্ম ইতিকথা,
সে 'লুসির'* সাথী শুনি
বলে ডারউইন জ্ঞানী
সবাকার আদি কুলপিতা।
বামুনের জন্ম হল
একই বীর্য্যে শূদ্র এল
জন্মিল হনুর ঔরসে,
হোমিনিড আদি পিতা
সাথী তার আদি মাতা
শুনিয়া বামুন কাঁপে রোষে।
অর্ধপশু ছিল তারা
নানা মাংসে পুষ্ট ওরা
পশুরক্ত বহে তার দেহে,
তাহারাই তব মাতা
হনুজাতি তব পিতা
ভুলে থাক গরবের মোহে।
তাদের শোনিত বহে
বামুনেরও অঙ্গ দেহে
লাখো লাখো যুগযুগ ধরিয়া,
চণ্ডাল শরীরে দেখি

একই রক্ত, জীন একই
গোপন করিতে হও মরীয়া
একই পিতার সন্তান
আদি গোত্র হনুমান
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল তব ভাই,
জন্মসত্য গোপন করি
বামুনের ভেক ধরি
দেবতার পাশে মাগ ঠাঁই।
ইথিওপ আফ্রিকান
প্রকৃতির ফরমান,
বিবর্তন নিয়ম মেনে হনু হলো স্যাপিয়ন;
ইরানীরা তুতোভাই
বাঙালিনী তার বোন.
রক্ততুতো ভাই বোন হিন্দু মুসলমান।
একই বীর্য্যে সৃষ্টি সব বামুন কি চণ্ডাল
হনুবীর্য্যে জন্ম তব ইতিহাস আদিকাল।
ব্রহ্মার মুন্ড হতে বামুন জনম
শুনি সে কপট শাস্ত্র না হয় হজম।
ব্রহ্মপদ অংশে যদি শূদ্রদেহ হয়,
কেমনে সে দেবঅঙ্গ অচ্ছুৎ রয়??
যেমতি রক্ত তাঁর মাথাপানে ধায়
তেমতি চণ্ডালরক্ত বামুন মাথায়।
ব্রহ্মপদ পূজে যদি পূণ্যবৃদ্ধি হয়,
শুদ্রপদ চুমে কেন স্বর্গপ্রাপ্তি নয়?

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন সবাকার হাত ধর,
জাতির নামে বজ্জাতি সব জাল জালিয়াতি ছাড়।
কেটে ফেল টিকি ছিঁড়ে ফেল সুতা,
কেউ উঁচু নয়, এক পিতামাতা।
ডোমের পরশে শুদ্ধ হইয়া অমৃত বরণ কর।

উপনয়ন শেষে নাতির প্রতি উপদেশ

নাতি হলো ব্রহ্মচারী
ভিক্ষা দিল যত বুড়ি,
নাটক দেখিয়া শেষে
করে ভোজ ভুরি ভুরি।
নাতী খেল কাঁচকলা
আতপ চালের ভাত,
অতিথিরা মুরগী পাঁঠা
চেটেপুটে সাফ পাত।
পৈতা দেখিয়া হাবা
নেয় তব পদধূল,
শূদ্রদিদা পূন্যলোভে
হইল ব্যাকুল।
ষাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে
মাথা তব পায়,
দেখিয়া জগৎবাসী

লাজে মরে যায়।
শূদ্র বলি দাদুমুখ
দেখিবেনা নাতি,
বামুনত্ব কেঁচে যাবে
হেরি নিচু জাতি।
বামুনের ভবিষ্যৎ
জানিবারে চাই,
কালে কালে বড় হয়ে
কি করিবে ভাই।
মানস চোখেতে দেখি
পশিছে সে গৃহীঘরে
করিয়া নানান ভঙ্গি
দেবপূজা নাট্য করে।
প্রণামী ট্যাঙ্কেতে পুরি
চালকলা ব্যাগে ভরি
পুরুত ফিরিছে গৃহে
মাথা তার নিচু করি।
দেখি সে লালসদৃশ্য
সবে দেয় গঞ্জনা,
দাদু কি সহিতে পারে
নাতির সে যন্ত্রনা?
পদধূলি চাটে বটে
দখিনাও ছুঁড়ে দেয়,
নরকের ভয়ে গৃহী

অভিনয় করে হায়।
পুরুতকে সম্মান
করে যত যজমান,
বেচারা আড়ালে গেলে
পিছে করে গালিদান।
উপরে দেখায় ভক্তি
অন্তরে ঘৃণা,
নাতির ভবিতব্য দেখি
হয় মনে যন্ত্রনা।
কানে কানে বলি তারে
পুরুত হয়োনা ভাই,
সৎ কোন পেশা ধরে
খেটে খুটে খাওয়া চাই।
পুরুতের হীন পেশা
ধরোনাকো তুমি,
বাঁচাও ক্ষত্রিয় হয়ে
নিজ জন্মভুমী।
অথবা বাণিজ্য করো
বৈশ্যের মতন।
চাকুরিও ধরিতে পার
শুভ্র যেমন।
ঘন্টা নাড়িয়া তুমি
আরতির ঢং করি
উঞ্ছবৃত্তি করোনাকো

পরধন নিয়া কাড়ি।
স্টেজ থেকে নেবে এস
নাটক হয়েছে শেষ,
অভিনয় আর নয়
ছেড়ে ফেল ছদ্মবেশ।
ছিঁড়ে ফেল পৈতা
কেটে ফেল টিকি,
বিশুদ্ধ মানুষ হও
হয়োনাকো মেকি।

সূচিপত্র

ক্ষয়িষ্ণু চেতনা

লিখেছেন – বিপ্লব সেন



ভয়টা কোথায় প্রশ্ন করা সমাজের
চেতনার কাছে,
যদি বাস্তব দেখতে হয়
যদি কল্পনা হয় মিছে!
ধর্মের আবর্তে ঘুরে চলা
সামগ্রিকতায় দেখা
যেখানে চোখ ধাঁধানো মুক্ত বাজার
অথচ চেতনা ফাঁকা।
বাস্তবতার কাপড়ের তো নেই
চাকচিক্য
খোলা বাজার ঝকঝকে দোকান
পিছনের দৈন্যতার ভরা ঐক্য।
এই বাস্তবতা এড়িয়ে চলতে

ভয়ের আয়োজন
যাতে মানুষের চোখে থাকে
ধর্মের সন্মোহন।
সামগ্রিক ভাবে চেতনায় আসে
সম্পূরক পরিপূরকের ধারণা
কার্য কারণ মূল্যবোধে
শুধুই চেতনার তাৎক্ষণিক উন্মাদনা |
বিচ্ছিন্ন ভাবে নয় এটা
সামগ্রিক বিষয়
শোষণের এই পরাকাষ্ঠা
পুরোটাই অন্ধকার সময় |
মানুষের চেতনায় আঘাত করে
পঙ্গু করে দেওয়া
পিছনে লম্বা শক্তিশালী হাত
আছেই আছে ছোঁয়া!
বিজ্ঞান চেতনা প্রতিনিয়ত
করা চাই অনুশীলন
প্রগতির এই চলমান পক্রিয়া
সেটাই করা বর্ণন!
পরিবর্তনের এই পৃথিবীর বুকে
হচ্ছে বিকৃত বিকাশ
পরিপূর্ণতার বদলে ক্ষয়মান
অবকাশ।
তাই একবিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়েও

প্রচার মাধ্যমে সাধু মৌলবী আর ধর্মের রমরমা
বিজ্ঞানের প্রচার চাকচিক্য হীন
অদ্ভুত বিকৃতির মূর্ছনা।
সারা পৃথিবী আঁধারে ঢাকা
চেতনা অপসৃয়মান
আপেক্ষিকতায় চেয়ে দেখা
কেন মানুষের এমন অবস্থান।
ভীতি কাজ করে শাসন শোষণের
মধ্যে
ব্যাক্তি নয় ভয় তা দেখা সমাজের
ব্যবস্থার সান্নিধ্যে।

সূচিপত্র

নিয়মের রাজত্ব

লি খে ছে ন – রা মে ন্দ্র সু ন্দ র ত্রি বে দী



বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আগাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে

ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্তমান, তাহার একটাকেও ফাকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাহারা সকল সময় নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগযুদ্ধের পরিবর্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়। বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সম্পর্ক লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠ অন্বেষণ না

করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

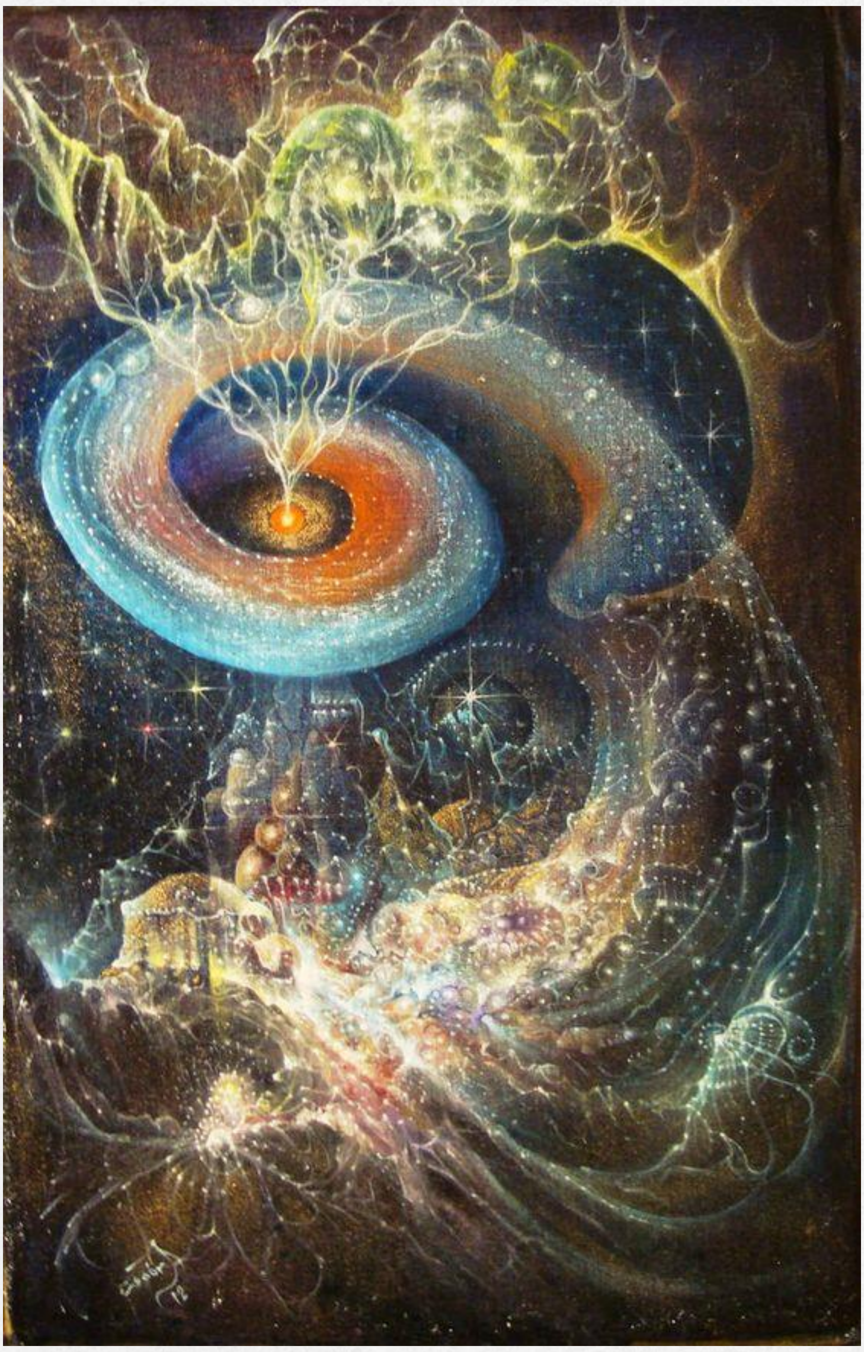
ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই উর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃত্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে— লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেহ না, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল, খাঁটি নারিকেল, যাহার

ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশুট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।



তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই

নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হরিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেরই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে, শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে, ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিনতুজল উইতে তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করিলে সুপ্রিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ও প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর – আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে

রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ! এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম :—

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধ্বগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের

মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিতার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদ মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যাভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা

জলে বাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া; নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখঅনে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্ধা করিয়া বলিবেন, — দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্ধ্বগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের অধিক হইল, এক জন লোক পৃথিবীতে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল ফলেই ও আতা ফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন দূরারূঢ় চন্দ্রদের পর্যন্ত পৃথিবী মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শ লাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই, সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্যের



অভিমুখে চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন, বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্রা হইতে এত দূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চণ্ডা পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বলতু দূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও, না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্যাদেব বর্ত্তমান; তুমি তাহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক্ দিয়াও একটু ঘুরিয়া চগিলতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখন্ডের মালা ভিরিয়া গর্ব্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই।

নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়াছিলে বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম: একটা কঠোর আইন। এই আইন ভালা করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত। সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌরজগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌরজগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক ঘোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া মুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্য আর এক ঘোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া পুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌরজগতের বাহিরেও এই আইন। বলবৎ। কিন্তু সর্ব্ব বলব কি না, বলা যায় না। কেননা, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরপর হইতে এত দূরে আছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামানা যে, তাহা আমাদের গণনাতে ভাসে না, আমাদের প্রত্যক্ষগোচরও হয় না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে, কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছে না, তাহা হইবে কি হইবে? যদি বিশ্ব সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মান্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌরজগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব-জগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়েমর ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন,— জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন-না-কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম; যত দিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম—এই নিয়ম অনিবার্য্য, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা। তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম

সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—অহো, এত দিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম; যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিস্তৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম, এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না, নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তর মুখে থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায়

যতটা হেলিয়া আছে, লন্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই, না থাকিবারই কথা; ইহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়। দুই শত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ও নিয়ম। প্রতি এগার বৎসর একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিশ্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী ঊষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত, ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিয়া সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে—আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম। অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক সোজা পথে

না গিয়া আশে পাশে কিছু দূর পর্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে-কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নাহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একযোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক

নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সিম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যাগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মান্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদ্যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ-ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

সূচিপত্র

ASK RATIONALISTS

প্রশ্নোত্তর পর্ব



প্রশ্ন - ১

যদি আমাদের মহাবিশ্বের কোনো creator থেকেও থাকে তাহলে কি ধর্মগুলির লেখাসমুহ কি মানুষকে মেনে নিতে হবে? ধর্মগুলোতে যে creator এর বর্ণনা আছে সেটা যে কাল্পনিক creator এটা বিজ্ঞান কি এখনও প্রমান করেনি?

অরিজিৎ, বীরভূম

উত্তর: –

"এরকম যুক্তি মনস্ক প্রশ্ন তোলার জন্য আপনাকে প্রথমেই অভিনন্দন জানাই।

এটা সত্যি যে এই সুবিশাল বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি, প্রসারণ, সংকোচন বা বিনাশের ইতিহাস আমরা হয়তো অতি সামান্যই জানতে পেরেছি।

কিন্তু বিবর্তনের পথ ধরে হোমো স্যাপিয়েন্সের সৃষ্টির পরে এই কয়েক হাজার বছরে এতটা জানাও কোনভাবেই কম নয়। ফলে, আমরা সবটুকু এখনো জানিনা এই অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে একজন মহান সৃষ্টিকর্তা এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করেছেন এরকম অলীক, অলৌকিক তত্ত্ব মেনে নেওয়া একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যত এগোচ্ছে তত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ম্ভু এবং এর প্রতিটি গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে সবকিছুর সৃষ্টি ও বিনাশ এক একটা অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল যা কোনভাবেই কোন ঈশ্বর বা ডিভাইন পাওয়ারের পূর্বনির্দিষ্ট নয়।

এটা সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত।

এরকম অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে এবং চলতেই থাকবে। কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলেই একটা গ্যাসীয় পিন্ড ছিটকে গিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত, শীতল হয়ে আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। একইভাবে এটাও একটা Random vigorous reaction এরই ফল যে সেই আদিম পৃথিবীর hot dilute soup এর ভিতর কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেনের মত অজৈব পদার্থের বিক্রিয়ায় প্রোটিনের একক অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছিল। তারও পরে সাড়ে তিনশো কোটি বছর ধরে বিবর্তনের ফলে হোমো স্যাপিয়েন্সের সৃষ্টি হয়েছে। জীব বিবর্তনের এই প্রতিটি ধাপই আসলে এক একটা

অ্যাক্সিডেন্ট। সৃষ্টির পরে পাঁচবার এই পৃথিবীতে মহাবিনাশ ঘটেছে যার ফলে তৎকালীন পৃথিবীর নব্বই শতাংশের বেশি জীব মারা যায় এবং অবশিষ্টদের বিবর্তনের দিক ঘুরে গেছে। অনেকে দাবি করেন যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির জন্য বিবর্তন করিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের যদি মানুষ সৃষ্টিই উদ্দেশ্য হত তাহলে এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কেন তা করতেন সরাসরি একমুহূর্তে তা করতে পারতেন। তাছাড়া এরকম ভাবার কোন কারণই নেই যে বিবর্তন শেষ হয়ে গেছে তা প্রতি মুহূর্তে চলছে। ভবিষ্যতে এরকম কোন মহাবিনাশের ফলে বর্তমান সিনোজোয়িক যুগের সকল জীবই হয়তো বিনষ্ট হতে পারে, পুরো পৃথিবীই ধ্বংস হতে পারে। সবকিছুই হতে পারে কারণ কোন কিছুই অলৌকিক সত্ত্বা দ্বারা নির্ধারিত নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।“



মনীশ রায়চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

প্রশ্ন - ২

মহাবিশ্ব ও সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে অসীম আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না। সেই অসীমতার মধ্যে শূন্যতা কোথায় ছিল? অসীম আর শূন্যতা একইসাথে অবস্থান করতে পারে না। কারণ একটি অপরটির অস্তিত্বকে ভুল প্রমাণ করে। এখানে অসীম ও শূন্যতা বলতে কী বোঝায়?

হোসেনুর রহমান

ভাঙড়, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা

উত্তর: -

“মহাবিশ্ব ও সকলকিছু সৃষ্টির পূর্বে অসীম আল্লাহ/ঈশ্বর/ভগবান ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না" এই কথাটা ধর্ম বিশ্বাসী দের কথা এবং এর সাথে বিজ্ঞানের কোনো যোগ নেই অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বর স্বীকার্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অতএব আগে দেখা যাক এই বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ কি বলেছে। কোরানে বলা হয়েছে পৃথিবী, আকাশ তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্বে বা সহজ কথায় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে জলের উপর আল্লাহর আরজ (সিংহাসন) অবস্থান করতো আর আল্লাহ সেই আরজে অবস্থান করতো (কোরান-হূদ ১১:৭)। বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অন্ধকারে

অবস্থান করতো (পবিত্র বাইবেল, আদি পুস্তক ১:২-৩)। তিনিই আলো হতে বলায় তবে সবার প্রথম আলোর উদয় হয়। বাইবেলের মতো এই একই রকম বর্ণনা ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থ তোরাহ (Torah) তে উল্লেখ পাওয়া। যদি হিন্দু পুরান (শিব পুরাণ-পর্ব ১, Aitareya Upanishad (3.4.1)) দেখা যায় তাহলে সৃষ্টির আদিতে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ছিলনা, ঘোর অন্ধকারে ছিল শুধু ব্রহ্ম। চারিদিকে শুধু জল ছিল ও ভগবান বিষ্ণু জলের উপর ঘুমাচ্ছিলো এবং বিষ্ণুর নাভি থেকে ফোঁটা পদ্মে ভগবান ব্রহ্মার জন্ম যিনি পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। এতক্ষনে আমরা দেখলাম সব ধর্মে আদিতে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে জল ছিল আর জলের আশেপাশে আল্লাহ/ঈশ্বর/ব্রহ্মের আত্মা ঘুরঘুর করছিলো এবং কতদিন যে ওই অবস্থায় ছিল এই বিষয়ে কোথাও বিশেষ কিছু বলা নেই। আরো বড়ো কথা ওই জল এল কোথা থেকে? ওই জল কে সৃষ্টি করলো? ওই জল থেকে কি ঈশ্বরের আত্মার সৃষ্টি? তাছাড়া সব জায়গায় আল্লাহ/ঈশ্বর/ব্রহ্মের আত্মাকে নিরাকার বলা হয়েছে, আবার কোথাও নিরাকার আত্মার বসার জন্য সিংহাসন দরকার পড়েছে। জল এবং সিংহাসনের উপস্থিতি জানাচ্ছে "স্থানের, বা শূন্য স্থানের(space ওর vaccum)" অস্তিত্ব ছিল অর্থাৎ শূন্য বলতে যেটা প্রশ্নে বোঝানো হয়েছে সেই শূন্যের সঙ্গে ধর্ম গ্রন্থের শূন্যের আকাশ পাতাল তফাৎ। ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে অসীম বলা হলেও কোন দিক থেকে

অসীম ছিল তা নিয়ে বিশেষ কিছু বলা নেই। তবে এটা সহজেই অনুমান করাযায় আল্লাহ/ঈশ্বর/ব্রহ্ম শক্তি বা ক্ষমতা, জ্ঞান ইত্যাদির হিসাবে হয়তো অসীম কারণ তার আকার অসীম মানে বেশ মোটাসোঁটা, দৈত্যকার চেহারার কেউ এই বিষয়য়ে কেউ কিছু বলেনি। যাই হোক এবার আমরা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আলোচনা করি।



পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মাধমে। বিগব্যাং এর পূর্বে কোনো কিছুইর বা কারোর অস্তিত্ব ছিলোনা। ছিল না সময় ও স্থানের অস্তিত্ব। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে প্রথমে বৈজ্ঞানিক Alexander Friedmann (১৯২৪) ও Georges Lemaître (১৯২৭) সম্পসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা দেন। পরবর্তী কালে Edwin Hubble পর্য্যবেক্ষনের মাধ্যমে এই ধারণাকে প্রতিষ্টিত করে। যদি

সম্পসারণশীল মহাবিশ্বকে সময়ের উল্টোদিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের গণিতের মাধ্যমে দেখানো যায় এই সম্পসারণশীল মহাবিশ্ব শুরুতে খুবই ছোট একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল যা পরবর্তীকালে প্রসারিত হয়ে স্থান, কাল, ও সমস্ত ভরের সৃষ্টি করেছে (১৯৩০, Nature: Georges Lemaître)। এই ছোট সীমাবদ্ধ অঞ্চলের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব অসীম ছিল।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেখানো যায় শক্তি থেকে ভরের উদ্ভব সম্ভব,যা একটি পরীক্ষিত সত্যি (উদাহরণ: Pair Production)। আবার হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে দেখানো যায় শূন্য থেকে স্বল্প সময়ের জন্য শক্তি ও প্রকারান্তরে ভরের (বা পদার্থের) উদ্ভব সম্ভব (উদাহরণ: Virtual Pair Production)। অতএব সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যার নিয়ম মেনে কোনো রূপ অলৌকিক শক্তির উপস্তিতি ভিন্ন মহাবিশ্বর উৎপত্তি ব্যাখ্যা সম্ভব। এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যতদূর বুঝতে পেরেছেন তাহলো কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে মহাবিশ্বর (অর্থাৎ স্থান, কাল, পদার্থের) উৎপত্তি। বিগব্যাংগের আগে কিছুই ছিলোনা না ছিল স্থান, না ছিল সময় আর না ছিল পদার্থ বা শক্তি অর্থাৎ প্রকৃত শূন্য ছিল। অতএব ঈশ্বরের ও অস্তিত্ব ছিলোনা। এখনো পর্যন্ত বিগব্যাং তত্ত্বের সাপেক্ষে পাওয়া প্রমান গুলির মধ্যে মুখ্য গুলি হলো হাবল এর সূত্র ও মহাবিশ্বের সম্পসারণ, কসমিক

মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, হালকা মৌল যেমন ডিউটেরিয়াম (H - 2), হিলিয়াম -3 ও লিথিয়াম-7 ইত্যাদির প্রাচুর্য।

এবার আসা যাক জলের কথায়। বিগব্যাংগের প্রথম ১০০ সেকেন্ড থেকে ৩০ মিনিট এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রথম তিন মিনিটে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব হালকা মৌল সমূহ উৎপাদনের উপযুক্ত ছিল। এই সময় হাইড্রোজেন (~৭৫ %), হিলিয়াম (~২৫%) এবং খুব সামান্য ডিউটেরিয়াম (H - 2), হিলিয়াম -3 ও লিথিয়াম-7 উৎপন্ন হয়। এর থেকে ভারী মৌল সমূহ যেমন কার্বন, অক্সিজেন বা অন্যান ধাতু সমূহ উৎপন্ন করতে তারা (star) দের দরকার এবং এর জন্য বিগব্যাংগের পর আরও ২০০ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তার মানে বিগব্যাংগের ২০০ মিলিয়ন বছর পর জলের অনুর উৎপত্তি।

এবার আলোচনা টাকে শেষ করি অসীম ও শূন্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে। পদার্থবিদের কাছে কোনো কিছু ক্ষুদ্র শূন্য আর কোনোকিছু খুব বড়ো হলো অসীম। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস এর ব্যাসের (10-15 m) সঙ্গে এক আলোক বর্ষ দুরুত্বের (9.461x1015 m) তুলনা টানা হয় তাহলে, আলোক বর্ষ দুরুত্বের কাছে একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস এর ব্যাস এর মান শূন্য। একটা নিউট্রন তারার কেন্দ্রের ঘনত্ব বা একটা সুপারনোভা তারার কেন্দ্রের তাপমাত্রার

থেকে বিগব্যাংগের সময়কার ঘনত্ব বা তাপমাত্রা আরো বহু লক্ষ কোটি গুন্ বেশি ছিল তাই এদের অসীম বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। বিগব্যাংগের শুরুর সময়কার অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা এখনো চলছে। ভবিষ্যতে যায় এই বিষয়ে আরো তথ্য উঠে আসবে।”



সৌমেন মন্ডল

গবেষক

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স

প্রশ্ন - ৩

ঘুমের মধ্যে অনেকে কথা বলে ও গোঙানির মত আওয়াজ করে। আমাদের গ্রামের দিকে সেটিকে বলে বোবা ধরেছে কিংবা ভুত ডাইনী ধরেছে। এইটি কি কোনো রোগ? এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই, এবং প্রতিকার বললে ভীষন ই উপকৃত হব।

সুজয় বিশ্বাস, বামন গোলা, মালদা

উত্তর:-

“কদিন ধরে রুপালি বেশ মানসিক চাপে আছে। রাতে নানান স্বপ্ন দেখে। বেশিরভাগ সময় তখন তার মনে হয় তার হাত পা পুরো অবশ হয়ে আছে।তাকে যেন কেউ চেপে ধরে আছে।অথচ তাকে যে ঠেলে উঠে পড়বে সে

ক্ষমতাও নেই।পুরো হাত পা যেন অবশ হয়ে আছে। তার বোধহয় আর জীবনে ঘুম থেকে ওঠা হবে না!

ঘুমের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা কে অনেকে বোবায় ধরা বা ভুত ডাইনী ধরা বলে।এমন বোবায় ধরার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়। ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় স্লিপ প্যারালাইসিস (sleep paralysis)..।প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলে বুঝতে পারবেন যে এখানে ভূত- প্রেত ডাইনীর কোন কাজ কারবার নেই। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা (Psychological disorder)। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

মানুষের ঘুমের ৫টি পর্যায় যেগুলো চক্রাকারে চলতে থাকে। এই পর্যায়গুলো দুটি দশাকে কেন্দ্র করে হয়। এর একটি REM (Rapid Eye Movement) এবং অপরটি Non REM।ঘুমের REM দশার স্থায়িত্বকাল মাত্র দুই ঘন্টা। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের স্বপ্ন দেখার কাজটি সম্পন্ন হয়। REM কে বলা হয় ঘুমের সক্রিয় অবস্থা। এ সময় আমাদের মাংশপেশিতে শিথীলতা আসে (muscles relaxed) এবং দেহ অবশ হয়ে যায় আর আমরা হয়ে পড়ি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।Non REM দশার স্থায়িত্বকাল অপেক্ষাকৃত বেশি; প্রায় ৪-৫ ঘন্টা। ৫টি পর্যায়ের ৪টিই এই দশার দখলে।

কোন কারণে আমরা যদি REM দশা শেষ হওয়ার পূর্বেই জেগে উঠি তখনই বোবায় ধরার ঘটনা ঘটে। এ সময় আমরা ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী এক অবস্থায় অবস্থান করি। ফলে মস্তিষ্ক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যে, আমরা আসলে কোন অবস্থায় আছি। আর তখনই উদ্ভট সব অনুভূতি হতে থাকে।

বোবায় ধরার অনুভূতি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। মনে হয় যেন আমি জেগে আছি, আশপাশের সবাই চলাফেরা করছে কিন্তু আমার হাত-পা নাড়াতে পারছি না বা কাউকে ডাকতে পারছি না; সমস্ত শরীর যেন প্যারালাইজড হয়ে গেছে। নিজেকে তখন অনেক বেশি অসহায় মনে হয়। আর ভাবনা আসে আর কখনও ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবো না। একটা জোর প্রচেষ্টা থাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার। যারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস রাখে অথবা যাদের হ্যালুসিনেশনের সমস্যা আছে তারা আরও একধাপ বেশি দেখে থাকে। এই যেমন কেউ বুকের উপর চেপে বসে আছে অথবা খাঁটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বা তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দু:খজনক হলেও সত্যি যে, আমরা অধিকাংশ মানুষ এখনও বোবায় ধরাকে ভূত প্রেতের কীর্তি বলে বিশ্বাস করি। শুধু যে বিশ্বাস করি তা নয়; একই সাথে এ থেকে পরিত্রানের আশায় অনেকে আবার ওঝা / গুনিন দ্বারা ঝাড়

ফুঁক দিয়ে ভুত তাড়ানোর চেষ্টা করি।। আশা করি এখন বুঝতে পারছেন যে এটা আমাদের শরীর বহির্ভূত কোন ঘটনা নয় বা অলৌকিক কোনো ঘটনা নয়।অলৌকিক বলে পৃথিবীতে কিছু হয় না। এটা একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। তাই এর সমস্যা মনোবিদরাই সমাধান করতে পারবেন, কোন ওঝা গুনিন নয়।”



পঞ্চানন মন্ডল

কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য, বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক, বিজ্ঞান মনস্ক, সোনারপুর শাখা

প্রতিষ্ঠাতা – বিজ্ঞানকথা

প্রশ্ন - ৪

১৯৮০ থেকে ২০২২, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা আছে, মানুষের চেতনার পরিধি বিস্তারলাভ করলেও, কোথাও যেন মানুষ ধর্মকে খড়কুটোর মত আশ্রয় করেই নিমজ্জিত হয়ে চলেছে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কার্যকরী পথ কী? অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনিতা কি চেতনা বিকাশের সময় কেড়ে নিচ্ছে? যোগাযোগের সময় কি কমে গেছে? সচেতন করার কার্যকরী পথ কী?

মহম্মদ মহসীন

মানিকপুর, হুগলী

উত্তর: -

"সৌদি আরবের নাগরিকদেরতো অর্থের অভাব নেই। কথা বলার সুযোগটা দরকার। অনবরত বিতর্কের মধ্য দিয়েই সমাজকে এগিয়ে নিতে হবে।"



মুজিব রহমান

সভাপতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা।

এবং বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ, মুন্সিগঞ্জ জেলা।

প্রশ্ন - ৫

একটা ঘটনা শুনছিলাম youtube এ যে একটা হোটেল রুমে ভৌতিক ঘটনা। উত্তরাখণ্ডে আলমড়া তে। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছেনা, বাথরুমে কল ঘুরে যাচ্ছে নিজে থেকে। এবার ধরুন এটা hallucination হতে পারে। যেমন ধরুন কেউ বৃন্দাবনে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে দেখলো রাতে বারান্দায় কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। এবার দুটো সম্ভাবনা। হয় মিথ্যে বলছে নয়ত সত্যি hallucinate করছে। কিন্তু ওর মন তো ওটা সত্যিই দেখছে। অনেকটা রামকৃষ্ণের কালী দেখার মত। ওর মন ওটা ক্রিয়েট করছে। এই ক্ষেত্রে কি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে যদি নিয়ে থাকি যা তার অনুভূতি টা সত্যি।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বৈদ্যবাটী

উত্তর: -

“প্রতি, অভিজিৎ ভট্টাচার্য

নমস্কার,

ভৌতিক ঘটনা নিয়ে সোসিয়াল নেটওয়ার্কে অনেক ভিডিও ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এই ধরণের ভিডিওগুলি কোনও না কোনও ব্যক্তি রেকর্ড এবং এডিট করে ইউটিউব, ফেসবুকে আপলোড করে থাকেন। কিন্তু এই ধরনের ভিডিও থেকে এটা প্রমাণ হয় না ভৌতিক ঘটনা ঘটে। ভৌতিক বা অলৌকিক বলে বাস্তবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এর পরেও যদি আপনি দাবি করেন ভুতুড়ে ঘটনা

কোনও ভুত, আত্মা ঘটিয়ে থাকে তাহলে সবার আগে এই প্রশ্ন উঠবে, ভূতের জন্মদাতা কে? ভূত আছে? প্রমাণ করতে পারবেন। উত্তরটা হবে কোনও দিন না। কারণ যার কোনও অস্তিত্ব নেই তাকে প্রমাণ করার অর্থ হলো রামকৃষ্ণের মত কালীকে দেখা। রাতের অন্ধকারে বিড়ালের শব্দকে ভৌতিক আওয়াজ ভেবে বসা। পাখির ডাকলে সেটা কৃষ্ণের বাঁশির সুর মনে হওয়া। আবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণে দরজায় জানলা খোলা বা বন্ধ হওয়ার পেছন কোনও অশরীরী হাত খুঁজে বেড়ানো। কোনও ঘটনার পেছন বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে না পেলে তাকে অলৌকিক বলে দেওয়া বোকামি। তাই সাতটি যদি আপনি সত্যি খুঁজতে চান তাহলে নিজে অনুসন্ধানে নামুন। নিজে যেদিন থেকে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানে নামবেন, সেদিন নিজেই বুঝতে পারবেন, ভূত, ভুতুড়ে, ভৌতিক সবই একটা গুজব ও কল্পনা। আমারা যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ, ভূত বা অলৌকিক বলে বাস্তবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এরপরেও যদি দাবি করেন, ভৌতিক ঘটনা ঘটে, তাহলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির 50 লক্ষ টাকার খোলা চ্যালেঞ্জ আছে। চ্যালেঞ্জ গ্রহন করুন।”



সন্তোষ শর্মা
সংযুক্ত সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

প্রশ্ন - ৬

Robert Svoboda এর বই Aghora তে আছে একজন জ্যোতিষী একটি ছেলের জন্মের আগেই তার আয়ু এবং বৈচিত্র বলে দিয়েছিল। সেটা মিলে গেছিল এমনকি দিনক্ষণই মিলে গেছিল। এটা কি সম্ভব? সেই ছেলেটি স্বল্পায়ু ছিল।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য
বৈদ্যবাটি

উত্তর: -

“কারোর হাত, পা, কপাল, মুখ ইত্যাদি দেখেই সেই ব্যক্তিটির অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত নিয়ে ঝরঝরিয়ে বলে যাওয়া দেখে জ্যোতিষীদের ক্লায়েন্ট যতই অবাক হোক না কেন আসলে সবটাই সহজসরল ধাপ্পাবাজি বা প্রতারণার খেলা। এই খেলার রহস্য ভেদ আমজনতা করতে পারেন না বলেই জ্যোতিষী নামক প্রতারকের দল মনের সুখে করেকম্মে খাচ্ছে, আমজনতার মাথায় কাঁঠালভেঙ্গে।

আচ্ছা, আপনি কি জানেন শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই এমন জনা পঞ্চাশেক জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকের ভেকধারী জ্যোতিষীরা আছে যাদের রোজগার কমকরেও ১০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি প্রতিমাসে যা সৎভাবে খেটেখাওয়া মানুষেরা কল্পনাও করতে পারেন না?

একজন সফল জ্যোতিষী হতে গেলে চাই, শয়তানি বা ধুরন্ধর উপস্থিত বুদ্ধি, মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা এবং কয়েকজন ইনফর্মার যারা টাকার বিনিময়ে ক্লায়েন্টদের হাঁড়ির খবর আপনাকে থুড়ি জ্যোতিষীদের এনে দেবে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতামন্ত্রীদের সাথে সখ্যতা এবং কয়েকটি পোষা গুন্ডা যারা বেয়াড়া যুক্তিমনষ্ক দের ক্যেলিয়ে কাঁঠাল বানাবে। এরই সঙ্গে আপনাকে মোটা টাকা লগ্নি করতে হবে এই জ্যোতিষীগিরি বা তান্ত্রিকগিরি নামক প্রতারণা পেশায়। যে যতবেশি পুঁজি লগ্নি করতে পারবে এই পেশায় (পড়ুন বিজ্ঞাপনের পেছনে) তার তেমনই প্রচারও হবে, ক্লায়েন্টের ভিড়ও বাড়বে। আর ক্লায়েন্টের ভীড় মানেই অর্থপ্রাপ্তি।

প্রসঙ্গত জানাই, বৃত্তিকর চাপান হয় আইনসম্মত পেশার উপর। আইন সম্মত পেশার একটা তালিকা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, টেডস, কলিংস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯-এ। প্রফেশন ট্যাক্স বিষয়ক আইন ১৯৭৯ এর সেকশন ও (২) তে আইন-সম্মত পেশার পূর্ণ তালিকা দেওয়া আছে। তাতে কোথাও 'জ্যোতিষ' এর নাম নেই। কারন 'জ্যোতিষ' এর কোন আইনি স্বীকৃতি নেই। বরং এদেশের আইন অনুসারে জ্যোতিষ পেশা বে-আইনি, নিষিদ্ধ, অবাঞ্ছিত, অনৈতিক এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

এবারে আসি জ্যোতিষীরা কিভাবে প্রতারণা করে খায়।

একজন সাধারণ গৃহবধুকে আপনি যদি বলেন- আপনি সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে আপনি যে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছে বা শখ দমিয়ে রেখে এত কষ্ট করে চলেছেন, তার প্রাপ্য সম্মান কিন্তু আপনি পাননি। দেখবেন ক্লায়েন্ট কেমন ঢিঁশ। কোনো দুধেআলতা ফর্সা চেহারাযুক্ত মহিলাকে বলুন - এই যে আপনি এতো সুন্দরী, তা এখনও পর্যন্ত কতগুলো প্রেমপত্র পেয়েছেন? এই কথাগুলো সামান্য রদবদল করে বলেই দেখুন, সেই মহিলাও ঢিঁশ। মূহুর্তে মোনালিসা মার্কা হাসির সাথে আপনার ভক্ত। এরপরে আপনাকে আর বেশি কিছু বলতেই হবে না, আপনার ক্লায়েন্টই গড়গড়িয়ে তার অনেক কথা আপনাকে বলে যাবে। আসলে প্রসংশা শুনতে প্রায় সকলেই ভালোবাসেন। আপনি ক্লায়েন্টকে ১০০ টা কথা বললে ওরা সেসবই মনে রাখবে যেগুলো তাদের মনপসন্দ, না মেলা কথাগুলো ওরা ভুলেই যাবে, ধর্তব্যেই আনবেন না।

কোনো মা, তার মেয়েকে আপনার চেম্বারে নিয়ে এলে বুঝে নিতে হবে মা, তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেজায় চিন্তিত। সুপাত্রর খোঁজ চালাচ্ছেন। আপনিও ঝোপ বুঝে কোপ মারুন। ক্লায়েন্ট পয়সাওয়ালা হলে সোনার প্রজাপতি

কবজ দিন, ক্লায়েন্টের আর্থিক অবস্থা ভালো না বুঝলে সোনার জলে চুবানো রুপোর কবজ বিক্রি করুন। কলকাতার বড়বাজারে এসব তাবিজকবজ, রত্নপাথর হোলসেল দরে পাওয়া যায়। কমদামী সেসব হিজিবিজি জিনিস কিনে এনে ক্লায়েন্ট বুঝে ১০ টাকার জিনিস ১০০০ টাকা বা তারও বেশিদামে ঝেঁপে দিন।

কোনো মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পুরুষকে বধ করতে চাইলে তাকে বলুন - আপনি অর্থোপার্জনের জন্য যেভাবে এতো পরিশ্রম করছেন, সেভাবে রোজগার হচ্ছে কি? কিংবা বলুন, আপনি কোনোদিন অর্থকষ্টে শেষ হবেন না, যেভাবে হোক ঠিকই টাকার ব্যবস্থা আপনি করে ফেলবেন কারন আপনি সৎ ও কর্মঠ। ব্যাস! এতেই অনেক। কথায় আছে, practice makes you perfect. আপনার অভিজ্ঞ চোখ এবং ক্লায়েন্টের মনস্তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা সঙ্গে ইনফর্মার দের ইনফরমেশন আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে সন্তানের পড়াশোনার উন্নতির জন্য অনেক বাবা, মায়েরা ভিড় জমান জ্যোতিষীদের চেম্বারে। পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনীকে কয়েকটা ভালোভালো জ্ঞানের কথা শুনিয়ে সরস্বতী কবজ বিক্রি করুন। সারাবছর পড়াশোনা লাটে তুলে, সারাদিন ফোনে ডুবে থাকা পোলাপান দের পরীক্ষায় ১০০ তে প্রায় ১০০ নং পাওয়ার নিনজা টেকনিক সরস্বতী কবচম। জ্বি,

এটাই সায়েন্স, জ্যোতিষ নামক প্রতারণা বিদ্যার সায়েন্স। যদিও জ্যোতিষ কখনওই বিজ্ঞান নয়।

পরিশেষে বলবো, জ্যোতিষ শাস্ত্রটাই যখন বে-আইনি, প্রতারণা এবং চিটিংবাজি। তখন আজ নয়তো কাল জ্যোতিষী, তান্ত্রিকদের জেলে যাওয়া আটকানোর সাধ্য কারোর নেই। তবে আমার ব্যাক্তিগত মতে শুধুমাত্র কঠোর আইন এনে এদের দমানো যাবেনা। কারন টাকা এবং রাজনীতিক পরিচিতির সুবাদে এরা আইন কে পকেট বন্দি করে ছাড় পেয়ে যাবে। এদের একটাই ওষুধ। সেটা হচ্ছে বয়কট করা।”



অভিষেক দে

প্যারানরমাল এক্সপোজার

সক্রিয় বিজ্ঞান কর্মী, যুক্তিবাদী,

সাংগঠনিক সদস্য, চেতনার অন্বেষণে

প্রশ্ন - ৭

আমি ফেসবুকে নিয়মিত অনুকুল ঠাকুর কে নিয়ে খিল্লি করি, মিম শেয়ার করি। আমার এই সব activities দেখে আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে মেসেঞ্জারে সতর্ক করে জানায়-"You can also cheat people in this way but U can't disregard IPC 295A .

After all you r a govt. Employee.

In our country all dharma and dharma gurus are legal as per constitution."

আমি IPC 295A সম্পর্কে জানতে চাই।এই ধারার আমাকে কেউ অভিযুক্ত করলে ঝুঁকি কতখানি, আর এর থেকে বাঁচার উপায় কি?

রামাননন্দ ঘোষ
বাঁকুড়া

উত্তর: -

“দন্ডবিধি ১৮৬০, অনুচ্ছেদ ১৫র ২৯৫ ধারা থেকে ২৯৮ ধারা(IPC-295-298) পর্যন্ত সংশোধন করা প্রয়োজন এবং এর মধ্যে ২৯৫-ক(IPC-295A) ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা প্রয়োজন বলে মনে করি। সংবিধান প্রতিশ্রুত নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী এই আইন।

আলোচনা,সমালোচনা,মতপ্রকাশ আর উস্কানি,বিদ্বেষ,ঘৃণাবাদ এক নয়। কিন্তু দন্ডবিধি-১৮৬০ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫-ক ধারাটিতে আলোচনা,সমালোচনা, বাক্ স্বাধীনতা তথা মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

ধারা ২৯৫-ক। কোন ব্যক্তি যদি ভারতের নাগরিকবৃন্দের কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও হিংসাত্মকভাবে লিখিত বা উচ্চারিত কথা কর্তৃক বা দৃশ্যমান কোন বস্তু কর্তৃক সে শ্রেণীর ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমানিত করে বা অপমানিত করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।"

এটা বলেছে। এখন যদি আমি বলি-

আমি পাঁঠা ছাগলকে ঈশ্বর বলিয়া এবং মানিয়া তাঁহার আরাধনা করি।

এখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি আমার পিতৃশ্বর পাঁঠা ছাগলের মাংস ভক্ষণ করে কিংবা ছাগলেশ্বরের কার্টুন আঁকিয়া আমার বিশ্বাস এবং *নুভূতিতে আঘাত দেয়, তাহলে আমি উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি আইনে মামলা করতে পারবো কি? হ্যাঁ, ছাগল হত্যাতেই কিংবা কচু গাছ কাটাতেই আমার অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে, আমার

ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে। তাহলে কি সংবিধান মেনে নেবে আমার দাবি/যুক্তি?

যদি মানে তাহলে তা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন। আর যদি না মানে তাহলে ৩৯৫-ক ধারাটি কোন যুক্তিতে অক্ষুন্ন আছে?

এটাও ক্লিয়ার করা প্রয়োজন, ধর্মানুভূতি কি শুধু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ? যদি না হয় তাহলে কোনো এক টঠাগটর অনুভূতিতে যেমন লেগেছে, সেরকম আমারো লাগতে পারে ছাগলের অপমানে। হ্যাঁ আমি মুরগি, কুকুর, গোরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষকে ঈশ্বর মানিয়া তাহাদিগের পুঁজা করি কিংবা ইবাদত করি এবং আরাধনা করার দিন ৩৬৫ দিন।

একটি সেক্যুলার তথা ডেমোক্রেটিক,রিপাবলিক রাষ্ট্রে কিসের ব্লাসফেমি?

IPC- 295A(1860) ধারা বাতিল করা প্রয়োজন।”



অভিষেক দে

প্যারানরমাল এক্সপোজার

সক্রিয় বিজ্ঞান কর্মী, যুক্তিবাদী,

সাংগঠনিক সদস্য, চেতনার অন্বেষণে

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকল সেগুলো পরের সংখ্যায় বেরোবে। ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিঋণ পিন্টারেস্ট ও ইন্টারনেট মাধ্যম।

সবাইকে ধন্যবাদ। নতুন বছরে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

"বিশ্বাস ও অন্ধভক্তি দিয়ে আর যাই হোক, বিজ্ঞানচর্চা বাঁচিয়ে রাখা যায় না।"

- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

*লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

ডিসেম্বর সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

